KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলি-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher আতাউর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13. c.m.
Vol. & Number : ২৮/৩ ২৮/৪	Year of Publication : কার্তিক-পৌষ ১৩৯২ মাঘ-চৈত্র ১৩৯২
	Condition : Brittle / Good
Editor হুমায়ুন কবির	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

অলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, টামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

ত্রৈমাসিক
পত্রিকা
কার্ত্তিক-পৌষ

সম্পাদক হুমায়ুন কবির

১৮৬৭
খৃষ্টাব্দ
হইতে
ভারতের সেবায়
নিয়োজিত

বামার লরী

কলিকাতা · বোম্বাই · নিউ দিল্লী · আসানসোল

চতুরঙ্গ

মালবজাতির দেশ

দীনেশচন্দ্র সরকার

গাঙ্গেয় উপত্যকার দক্ষিণে, বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে, বুন্দেলখণ্ডের পশ্চিমে এবং আরাবল্লী পর্বতের পূর্বে অবস্থিত বিস্তৃত অঞ্চলটিকে মধ্যযুগ হইতে মালব বলা হইতেছে। প্রাচীন-কালে এই দেশের পশ্চিমাংশের নাম ছিল অবন্তি; উহার রাজধানী ছিল সুবিখ্যাত উজ্জয়িনী নগরী। মালবদেশের পূর্বভাগে আকর বা দশার্ণ জনপদ অবস্থিত ছিল; বিদিশা ছিল উহার প্রধান নগরী। সিপ্রা নদীর তীরবর্তী উজ্জয়িনী আজিও তাহার প্রাচীন নাম বহন করিতেছে। প্রাচীন বিদিশা নগরীর বর্তমান নাম বেসনগর। উহা বেতোয়া (প্রাচীন বেত্রবতী) নদীর তীরস্থিত ভেলসা নগরীর সন্নিকটে অবস্থিত।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যখন দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন মালবজাতি পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্গত মণ্টগোমারী অঞ্চলে বাস করিত। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর কিছুকাল পূর্বে মালবেরা রাজস্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। পঞ্জাবে ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক যবন, শক, পহ্লব এবং কুষাণদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত মালবজাতির স্থানচ্যুতির সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, রাজস্থানে আসিয়া মালবেরা বর্তমান টংক জেলার অন্তর্গত উনিয়ারার নিকট-বর্তী নগরীগ্রামে রাজধানী স্থাপন করে। নগরীগ্রামের তৎকালীন নাম ছিল মালবনগরী।

এই মালবজাতির সহিত সম্পর্কিত হইয়াই যে প্রাচীন অবন্তি ও আকর-দশার্ণ জনপদ পরবর্তীকালে মালবদেশ নামে পরিচিত হয়, তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে বর্তমান মালবের এই নূতন নামকরণ জনপ্রিয় হইয়াছিল, সেবিষয়ে ঐতিহাসিক-গণের সম্যক্ ধারণা আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ আমরা দেখিতে পাই, গুপ্তোত্তর যুগের সাহিত্য ও লেখাবলীতে যেখানেই মালবদেশের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, সে সমস্ত ক্ষেত্রেই উহাকে বর্তমান উজ্জয়িনী অঞ্চল বা মালবের সহিত অভিন্ন ধরিয়া লওয়া হয়।

সপ্তম শতাব্দীর সূচনায় মহাকবি বাণভট্ট তাঁহার "হর্ষচরিতে" থানেশ্বর, কান্যকুব্জ ও গৌড়ের নরপতিগণের প্রসঙ্গে মালবরাজের উল্লেখ করিয়াছেন। ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ঐহোলি শিলালেখে বাদামির চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী বাহুবলে লাট

(রাজধানী—সুরত জেলার অন্তর্গত নোসারী), গুর্জর (রাজধানী—ভরোচ জেলার অন্তর্গত নান্দীপুরী) এবং মালবদিগকে দমন করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। রাষ্ট্রকূট-বংশীয় তৃতীয় গোবিন্দের রাজত্বকালে (খ্রীঃ ৭৯৪-৮১৪) তদধীন লাটদেশের (অর্থাৎ দক্ষিণ গুজরাতের) শাসনকর্তা কর্ক দাবি করিয়াছেন যে, গুর্জরপ্রতীহার-রাজগণের আক্রমণ হইতে মালব দেশকে রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহাকে গুজরাতে স্থাপন করা হইয়াছিল। অনেকে এই সকল ক্ষেত্রেই 'মালব' বলিতে বর্তমান মালব বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু এ ধারণা সত্য বলিয়া বোধ হয় না।

হর্ষচরিতকার মালব বলিতে কোন দেশ বুঝিতেন, তদ্রচিত "কাদম্বরী"তে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। "কাদম্বরী"র একস্থানে বিদিশা নগরীর প্রান্তবর্তিনী বেত্রবতী নদীতে মালববিলাসিনীদিগের জলক্রীড়ার উল্লেখ দেখা যায়। আবার গ্রন্থের অন্যত্র উজ্জয়িনীকে অবন্তিদেশের নগরীরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বাণভট্ট পূর্বমালবকে 'মালব' এবং পশ্চিমমালবকে 'অবন্তি' বলিয়া জানিতেন। এইরূপ নাম-করণের স্মৃতি পরবর্তীকালেও মুছিয়া যায় নাই। কারণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাৎস্যায়নকৃত "কামসূত্রে"র 'জয়মঙ্গলা' টীকার রচয়িতা যশোধর মালবদেশীয় নারীকে 'পূর্বমালবভবা' এবং অবন্তিদেশের নারীকে 'উজ্জয়িনীদেশভবা' ও 'পশ্চিমমালবদেশীয়া' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এমনকি সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত "শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে"ও পশ্চিম ও পূর্ব মালবের নাম যথাক্রমে 'অবন্তি' ও 'মালব' দেখা যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই আকর-দশার্ণের 'মালব' নাম জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল; কিন্তু অবন্তিদেশের 'মালব' নাম তখন পর্যন্ত জনপ্রিয় হয় নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে মগধের গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য পশ্চিম ভারতের শকরাজ্য অধিকার করেন। তখন হইতে পশ্চিম মালবে ঔলিকরবংশ এবং পূর্ব মালবে তথাকথিত 'উত্তরকালীন গুপ্তবংশ' রাজত্ব করিতে থাকে। এই দুইটি রাজবংশই মালবজাতীয় ছিল বলিয়া বোধ হয়। উত্তরকালীন গুপ্তরাজগণ মালবজাতীয় ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের রাজ্য মালবদেশ নামে পরিচিত হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। পাশাপাশি দুইটি রাজ্যের এক নাম থাকিতে পারে না। তাই সম্ভবতঃ এ সময় ঔলিকর রাজ্যের নাম মালব হইতে পারে নাই।

কিন্তু চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী যে পূর্বমালব জয় করিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ, তিনি যে মালবজাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহারা দক্ষিণ গুজরাতের লাট ও গুর্জরদিগের প্রতিবাসী ছিল বলিয়া বোধ হয়। আবার রাষ্ট্রকূট লেখমালার মালবও পূর্বমালব হইতে পারে না। কারণ লাটদেশের শাসনকর্তার পক্ষে দূরবর্তী পূর্বমালব হইতে গুর্জরপ্রতীহার আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট লেখাবলীর 'মালব' অবশ্যই গুজরাত অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এই সম্পর্কে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএন-চাঙের সাক্ষ্য অত্যন্ত মূল্যবান।

হিউএন-চাঙ্ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম ভারতে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি উজ্জয়িনী (Wu-she-yen-na) এবং মালব (Mo-la-p'o) নামক দুইটি স্বতন্ত্র দেশের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণিত 'মালব' পূর্বমালব নহে। কারণ তিনি বলিয়াছেন যে মালবদেশটি Mo-ha (অর্থাৎ গুজরাতের মহী) নামক নদীর তীরে অবস্থিত এবং খেটক (বর্তমান খেড়া, Kaira) ও আনন্দপুর (বর্তমান বড়নগর) ঐ দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চালুক্য-রাষ্ট্রকূট লেখমালার 'মালব' এই গুজরাত অঞ্চলস্থিত জনপদ বলিয়া বোধ

হয়। অবশ্য সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দশকে কাঠিয়াবাড়ের মৈত্রকবংশীয় নরপতি শীলাদিত্য ধর্মাদিত্য উল্লিখিত মালবদেশ অধিকার করেন এবং শীঘ্রই প্রথম খরগ্রহ কর্তৃক উজ্জয়িনী অঞ্চলে মৈত্রকবংশের আধিপত্য প্রসারিত হয়। এই সময়ে কিছুকালের জন্য গুজরাতের মালব এবং বর্তমান পশ্চিমমালব একটি জনপদে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু দশম শতাব্দীর সূচনাতেও কবি রাজশেখর তাঁহার "কাব্যমীমাংসা"তে মালবদেশকে অবন্তি (উজ্জয়িনী অঞ্চল) এবং বৈদিশ (বিদিশা-ভেলসা অঞ্চল) হইতে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে পশ্চিম ভারতীয় জনপদসমূহের তালিকাতে দেখা যায়—'অবন্তি-বৈদিশ-সুরাষ্ট্র-মালবার্বুদ-ভৃগুকচ্ছাদি'। এখানে সুরাষ্ট্র (কাঠিয়াবাড়) এবং অর্বুদ (আবুপর্বত) নামক অঞ্চলদ্বয়ের মধ্যে মালবদেশ উল্লিখিত হইয়াছে। এই মালব হিউএন-চাঙ বর্ণিত গুজরাত অঞ্চলস্থিত মালব বলিয়া বোধ হয়।

পরমারবংশের আদি রাজগণ রাষ্ট্রকূট সম্রাটদিগের সামন্তরূপে গুজরাতের খেটক প্রভৃতি অঞ্চল শাসন করিতেন বলিয়া অনুমান করা যায়। কারণ দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে পরমাররাজ হর্ষ সীয়ক তদীয় সামন্ত খেটকাধিপতির অনুরোধে মহীনদীর তীরাবস্থিত স্কন্ধাবার হইতে তাম্রশাসন দান করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, হিউএন-চাঙের উল্লিখিত মালবদেশও এই অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। আবার পরমাররাজগণ যে মালবজাতীয় ছিলেন, তাহারও কিছু প্রমাণ আছে।

হর্ষ সীয়কের তাম্রশাসনে তাঁহার পিতামহ প্রথম বাক্‌পতিকে রাষ্ট্রকূটবংশীয় দ্বিতীয় কৃষ্ণের বংশধর বলা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, তাঁহার ধমনীতে রাষ্ট্রকূটবংশের কোন রাজকন্যার রক্ত প্রবাহিত ছিল। কিন্তু শীঘ্রই রাষ্ট্রকূট এবং পরমারবংশীয় রাজগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। তাই পরমারবংশের উত্তরকালীন লেখাবলীতে রাষ্ট্রকূট সংস্রবের বিষয় উল্লিখিত হয় নাই।

হর্ষ সীয়ক দাবি করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রকূট সম্রাট্ খোট্টিগ (খ্রীঃ ৯৬৮-৭৩) তৎকর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ৯৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ধনপালের "পাইয়লচ্ছী"তে এই ঘটনাটি ভিন্নাকারে উল্লিখিত হইয়াছে। ধনপাল বলিয়াছেন যে, মালবেরা রাষ্ট্রকূট-রাজধানী মান্য-খেটনগর অগ্নিদগ্ধ করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল। ইহা হইতে মনে হয় যে, "পাইয়লচ্ছী"র গ্রন্থকার পরমারবংশীয় হর্ষ সীয়ককে মালবজাতীয় বলিয়া জানিতেন। হর্ষ সীয়কের পুত্র দ্বিতীয় বাক্‌পতি মুঞ্জ ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উজ্জয়িনী অধিকার করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পরমারবংশীয় মালবেরা দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম মালবে আধিপত্য বিস্তার করে। তাহারা ধারানগরী (বর্তমান ধার) এবং মণ্ডপদুর্গ (বর্তমান মাণ্ডু) প্রতিষ্ঠা করিয়া সুদীর্ঘকাল পশ্চিম মালবে রাজত্ব করিয়াছিল। সম্ভবতঃ দশম শতাব্দী হইতেই প্রাচীন অবন্তিদেশের 'মালব' নাম জনপ্রিয় হইতে থাকে।

উপরে প্রাচীন মালবজাতির যে কয়েকটি উপনিবেশের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও কতিপয় স্থানের মালব নাম পাওয়া গিয়াছে। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারনাথ প্রয়াগ অর্থাৎ বর্তমান এলাহাবাদ অঞ্চলে মালব নামক স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তর-প্রদেশের ফতেপুর জেলায় 'মালবা' নামের একটি গ্রাম আছে। দক্ষিণ ভারতে 'মলব' নামক দু-একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি কল্যাণের চালুক্যবংশীয় ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের (খ্রীঃ ১০৭৬-১১২৭) সামন্ত অনন্তপাল দাবি করিয়াছেন যে, তিনি উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত সাতটি মালব দেশ জয় করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা হইতে সাতটি বিভিন্ন মালব দেশের

অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় কিনা, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু 'মালব' বা 'মলব' নাম দ্রাবিড়ভাষার 'পর্বতবোধক 'মলৈ' শব্দ হইতে উদ্ভূত; তাই দক্ষিণ ভারতে একাধিক পার্বত্য জাতিকে 'মালব' বা 'মলব' বলা হইত বলিয়া বোধ হয়।

প্রমাণপঞ্জী : (১) বাণভট্টকৃত "কাদম্বরী", হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৯ ও ১৮৩; (২) *Epigraphia Indica*, Vol. VI, p. 6, verse 22 ; Vol. XXXIV, p. 138 ; (৩) দীনেশচন্দ্র সরকারকৃত *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India*. pp. 91-92 ; (৪) রাজশেখরকৃত "কাব্যমীমাংসা", *Gaekwad Oriental Series*, p, 9 ; (৫) বাৎস্যায়নকৃত "কামসূত্র", ৬।৫।২২ ও ২৪ এবং তদুপরি যশোধরকৃত জয়মঙ্গলাটীকা; (৬) হেমচন্দ্র রায়কৃত *Dynastic History of Northern India*, Vol. II, pp. 848-51 ; (৭) হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীকৃত *Political History of Ancient India*, 1938 ed., p. 492 ; (৮) *Bombay Gazetteer*, Vol. I, Part ii, pp. 400, 569 ; (৯) Watters On Yuan Chwang's *Travels in India*, Vol. II pp. 242-47 ; ইত্যাদি।

কবিতা

ধর্ম বলেছিল

দিব্যেন্দু পালিত

ধর্ম বলেছিল, এসো, কাছে এসো, সম্মুখে দাঁড়াও—
রোদ্দুর এখন খুব খেলা করে পায়ের পাতায়;
প্রসারিত বরাভয়, ঐশ্বরিক হাতে আছে তাবৎ চাতুরি;
এসো, কাছে এসো, ক্রুশবিদ্ধ হই তোমার আলোয়...

স্মৃতি বলেছিল, আছে কোটায় ভ্রমর পরিপাটি—
জীয়ন্ত, যদিও দাঁত মাড়িগুলি তেমন সুদৃশ্য নয় আজ;
অদৃশ্য বাঁজাণু মাংস ক্রমাগত কীটদষ্ট করে;
তবু আমি দিতে পারি প্রত্যাবর্তনের সুখ, আমি দিতে পারি...

প্রেম বলেছিল, রক্ত সহ্যের অতীত কাজ করে—
বিষুবের নির্ভরতা সয়েছি দীর্ঘদিন, এখন নিয়তি
কিংবা তার প্রতিবিম্ব, শ্বাস ফেলে প্রতিটি নিঃশ্বাসে;
আমার শীতোষ্ণ ঘরে তবু আছে বিশ্রাম আশ্রয়...

ধর্ম, স্মৃতি, প্রেম নিয়ে কতকাল অলিন্দে তোমার
বিশিষ্ট বাতাস শুধু ছুঁয়ে গেল অন্তিম বিষাদ!

আমার ছেলেকে

শামসুর রহমান

খবরদার খোকা তুই কোনোদিন শিল্পের মৃগকে
দিবিনে ঘেঁষতে ত্রিসীমায়। বরং ডিঙিয়ে বেড়া
ভাষ্য, টীকা, দর্শনের মহানন্দে নিশ্চিন্তির ডেরা
বাঁধিস মনের মতো। জীবনকে সঁপে দিয়ে ছকে
বাজাবি ঢোলক নিত্য; চাকরির চরম নাটকে
সাজলে নিখুঁত হুকোবরদার, সমাজের সেরা
মুরুব্বির তল্পি ব'য়ে সামলালে নথিপত্র ঘেরা
অস্তিত্বকে, পৌঁছে যাবি উন্নতির প্রশস্ত সড়কে।

পক্ষান্তরে শিল্পের আঁতুড় ঘরে আছে কালকূট
হতাশার। রাত্রিদিন বিষাক্ত হাওয়ায় শ্বাস টেনে
কী পাবি অবুঝ তুই? অন্তহীন যন্ত্রণা, বিষাদ
অথবা পতন শুধু। সাফল্যের বিখ্যাত মুকুট
ক'জনের ভাগ্যে জোটে? তার চেয়ে শুষ্কচর্ম বেনে,
বীমার দালাল হওয়া ভালো, ভালো ফূর্তির আস্বাদ।

আশ্চর্য

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

আমার প্রেমের মুখ স্মৃতি হয়ে সারা ঘরে ঘোরে,
জীবন আশ্চর্য!
আমার স্মৃতির ফুল গন্ধে রঙে জাগে রোজ ভোরে,
জীবন আশ্চর্য!
আমার ফুলের কাছে একটি মৌমাছি আসে রোজ,
জীবন আশ্চর্য!
আমার মনের কণ্ঠে মৌমাছির গান কি সহজ!
জীবন আশ্চর্য!

সুখে-দুঃখে সুখী এই সৃষ্টি চলে কত বর্ষ ধরে,
জীবন আশ্চর্য!
অলক্ষ্য আঙুলে কার দিন-রাত্রি জপমালা ঘোরে,
জীবন আশ্চর্য!
প্রতি মুহূর্তের আমি সে-মালার গণিত জীবন,
জীবন আশ্চর্য!
আশ্চর্য জীবনে শুধু চমকালে মৃত্যু সাধারণ
চমকায় আশ্চর্য!

নগর কলকাতার অর্থনৈতিক সমস্যাবলী

শান্তিকুমার ঘোষ

কলকাতার উদ্ভব হয়েছে কয়েকটি গ্রাম থেকে। কোনো সুচিন্তিত পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে নয়, যখন যে রকম দরকার সেই সময়ের প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে মূলত এই নগরের সম্প্রসারণ হয়েছে। কলকাতার প্রায় ৬৫ লক্ষ অধিবাসীদের প্রয়োজন যে গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, নগরের আবশ্যিক সুযোগ-সুবিধা সেই হারে বাড়ে নি। পানীয় জল, রাস্তা-ঘাট, যানবাহন, জলনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধানের যে ব্যবস্থা এখানে আছে তা যথেষ্ট নয় এবং প্রায়শ তার অবনতি ঘটছে। কলকাতা মেট্রোপলিটান পরিকল্পনা সংস্থা হিসাব করে দেখিয়েছে যে, আগামী পঁচিশ বছরে কলকাতা মেট্রোপলিটান জেলা অর্থাৎ প্রায় ৪২৫ বর্গ-মাইল ব্যাপী হুগলী নদীর দু'পাশের শহর অঞ্চলে শতকরা অন্তত ৫০ ভাগ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হবে। বছরে শতকরা ৬ হারে জনবহুল এই জেলার আর্থিক উন্নয়ন করতে গেলে, এমন কি ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের এখনকার মান বজায় রাখতে হলে সমগ্র অঞ্চলটির কল্যাণ সাধনের বিধি-বন্দোবস্তের উন্নতি করা দরকার।

কলকাতা নগরের আয় বেড়েছে মন্দগতিতে; জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তা কোনো মতে সমতা রক্ষা করতে পেরেছে। উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ না করলে এই নগরীর আর্থিক অবস্থা ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়তে বাধ্য।

বৃহত্তর কলকাতার ব্যাঙ্ক, শিল্প ব্যবসা প্রভৃতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতি অনেকটা সন্নিহিত অঞ্চল, আসামের চা-বাগান এবং বিশেষ করে দুর্গাপুর-আসানসোলের শিল্প-সম্প্রসারণের মুখাপেক্ষী। কলকাতায় যে সব সুযোগ-সুবিধা (যেমন বিবিধ আনুষঙ্গিক শিল্প, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা, বন্দরের ব্যবহার) পাওয়া সম্ভব, দুর্গাপুর-আসানসোলের শিল্পোন্নয়ন সেগুলির চাহিদা বৃদ্ধি ঘটাবে। শেষোক্ত অঞ্চলে কলকারখানার প্রসার, কলকাতায় যে অত্যধিক চাপ বর্তমানে দেখা যায় তা কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে; শিল্প স্থাপনের ভিন্ন একটি জায়গা এবং শ্রমিকদের কাজ করবার নতুন একটি ক্ষেত্র পাওয়া যাবে।

শিল্প হচ্ছে কলকাতা অঞ্চলের কর্মসংস্থান ও আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। ১৯৬১ সালে এই নগরের বিভিন্ন কর্মে রত ১১·৭ লক্ষ লোকের মধ্যে ২·৩ লক্ষ কর্মী শিল্পে নিযুক্ত ছিল, তার ভেতর আবার ১·৭ লক্ষ জন রেজিস্ট্রীভুক্ত (১০ জনের অধিক কর্মী সমন্বিত যে কারখানায় বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করা হয়, অথবা ঐ শক্তি ব্যবহার করা হয় না এমন ২০ জনের বেশী শ্রমিক-সমন্বিত কারখানা) কারখানায় কাজ করতো। অঞ্চলটির অন্যতম মুখ্য শিল্প পাট-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের বেশী সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। অন্যদিকে, বলবিদ্যাসম্মত ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের যে দ্রুত বিকাশ হবে সেটা আশা করা যায়। ১৯৬১ সালে কলকাতা মেট্রোপলিটান জেলার ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক (২,৫৩,০০০); বয়ন শিল্পে ২,৪৭,০০০ জন কাজ করতো।

কলকাতার শিল্প-সংক্রান্ত অর্থনৈতিক সমস্যা জটিল হয়ে উঠেছে নানা সামাজিক কারণে। নগরের জনসমষ্টির শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ এসেছে পার্শ্ববর্তী পল্লী অঞ্চল ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে। আকর্ষণ করে এ-রকম কাজ-কর্মের সুযোগ কলকাতায়

যথেষ্ট না থাকলেও, গ্রামদেশে কাজের অভাব ও ক্রমিক দুর্দশায় তাড়িত হয়ে সেখানকার অধিবাসীরা ঐ নগরে চলে আসে। বাইরে থেকে লোকের এই স্বাভাবিক আগমনের উপর গত আঠারো বছর ধরে উদ্বাস্তু আসার ফলে নগরের জনবসতির ঘনত্ব বেড়ে গিয়ে প্রতি বর্গমাইলে ৭৬,৪৯০ হয়েছে। লোকবসতির নিবিড়তার দিক থেকে দেখলে কলকাতা পৃথিবীর সব চেয়ে ঘন নগরগুলির অন্যতম—এই ব্যাপারে তার স্থান রোমের (৮৩,৮৫০) পরেই।

নগর অভিমুখে লোকের আগমন কলকাতার জনসংখ্যা গঠনে একাধিক অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করেছে। প্রথমত, আগন্তুকদের অধিকাংশ হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, যারা স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনের সুবিধা ও শৃঙ্খলা থেকে বঞ্চিত (১৯৫৭-৫৮ সালে নগরের জন-সমষ্টির শতকরা ৬৫ ভাগ ছিল পুরুষ এবং ৩৫ ভাগ নারী)। বেশী সংখ্যায় একজন সদস্যের গৃহী ও মেসে-থাকা পরিবার অর্থাৎ কোনো রকম সম্পর্কহীন লোকদের উপস্থিতির ফলে কলকাতার সমাজজীবনে স্বভাবত স্থিতির অভাব ক্রমে প্রকট হয়ে উঠছে।

বাইরে থেকে লোক আসার দরুন শহরের জনগণ যে সব কাজকর্ম করে থাকে তার পরিবর্তন ঘটেছে। আদমসুমারির পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, দেশ-বিভাগের আগে, ১৯১১ ও ১৯৩১ সালের মধ্যে জনসমষ্টির শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ ছিল বাণিজ্যে নিযুক্ত। পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে বাণিজ্যেরত কর্মীদের শতকরা অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়ে ১৯৫১ সালে ৩২·৫৫-এ পৌঁছেছে। আগন্তুকরা প্রধানত ব্যবসায়ী, দক্ষ বা অদক্ষ কর্মী হয়ে থাকে। নবাগতদের বেশীর ভাগের কারিগরি বিদ্যা বা শিল্পসংক্রান্ত দক্ষতা নেই; অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই তাদের কাজের সংস্থান সম্ভব হয়েছে আর্থিক ব্যবস্থার প্রত্যন্ত অংশে। স্থানীয় প্রতিযোগিতা প্রবল নয় এমন বিশেষ ধরনের কাজ করে বলে স্বাভাবিক জনসংখ্যার অনুপাত হিসাবে আগন্তুকরা স্থিতিশীল।

আগামী বছরগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার ও আসামের শ্রমিক বাহিনী যে সমধিক পুষ্ট হবে তাতে সন্দেহ নেই। ঐ অতিরিক্ত কর্মীরা যদি তাদের এখনকার বাসস্থান বা তার কাছাকাছি অঞ্চলে কাজ না পায় তাহলে অতীতে যেমন ঘটেছে, সেই রকম, উদ্বৃত্ত কর্মীদের বেশ কিছু কলকাতা অঞ্চলে চলে আসবে। তখন বাড়তি কর্মপ্রার্থীদের তুলনায় কাজের সুযোগ বাড়ানো হবে জরুরী সমস্যা।

স্পষ্টত, কাজকর্মের প্রয়োজনীয় সুযোগ বৃদ্ধি নির্ভর করবে প্রাগুক্ত চারটি রাজ্যের অধিকতর শিল্পোন্নয়ন, সরকারী ও বেসরকারী অংশে মূলধন নিয়োগ ও কলকারখানায় শ্রমনির্ভর উৎপাদন প্রণালী প্রয়োগের উপর। দুর্গাপুর, বোকারো, রাঁচি, রাউরকেলা প্রভৃতি নির্মীয়মান শিল্পকেন্দ্রের চারদিকে কর্মপ্রার্থীদের কাজের সম্ভাবনা সম্প্রসারিত হবে আশা করা যায়। বড় কলকারখানা ঘিরে বিবিধ শিল্প গড়ে উঠলে পুরানো শহরের প্রসার ও নতুন শহরের উৎপত্তি হবে; সেই সঙ্গে কারখানাগুলির চারদিকে ও শহরগুলিতে নানা রকম কাজের জন্য কর্মীদের চাহিদা যাবে বেড়ে।

কলকাতা নগরে কর্মরতদের বেশ কিছু লোক আর্থিক ব্যবস্থার প্রত্যন্ত অংশের (ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ, জিনিসপত্র মজুত রাখা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ এই অংশের অন্তর্ভুক্ত) উপর নির্ভরশীল। শিল্প বা মাধ্যমিক অংশে যেখানে কর্মীদের শতকরা ২৬ ভাগকে নিযুক্ত দেখা যায়, প্রত্যন্ত অংশে সেখানে শতকরা ৭১ ভাগ কাজ করে। কলকাতার আর্থিক ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য হল সেখানে বহু লোক নানা প্রান্তিক ধরনের (যেমন,

রিকশাচালক, রাস্তার ফেরিওয়ালা) কাজে নিযুক্ত। অধিক উৎপাদনক্ষম উন্নত ধরনের কাজে এই সব ব্যক্তিদের লাগাবার বন্দোবস্ত করা দরকার।

কলকাতায় শিল্পে যত লোক কাজ করে তার প্রায় সমানসংখ্যক ব্যক্তি সেখানকার বাণিজ্যে নিযুক্ত। উত্তর-পূর্ব ভারতের একটা বিশাল অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কলকাতা বন্দরের মুখাপেক্ষী। ভারতের মোট আমদানী পণ্যের শতকরা ৪০ ভাগ ও রপ্তানী পণ্যের শতকরা ৪৫ ভাগ কলকাতা বন্দর দিয়ে আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। চা, পাট ও পাট-শিল্পদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে এখান থেকেই দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের বেশীর ভাগ উপার্জন করা হয়। ১৯৬১-৬২ সালে কলকাতার শুল্ক অঞ্চলে আমদানী কর থেকে ৫৮ কোটি ৩০ লক্ষ, রপ্তানী শুল্ক থেকে ৭ কোটি ২০ লক্ষ এবং আবগারি থেকে ৭৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা আয় হয়। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতের প্রধান বন্দরগুলিতে মোট যে ৮,৬৮২টি জাহাজ এসেছিল তার ভেতর শুধু কলকাতা বন্দরে প্রবেশ করেছে ৩৪৩-৪৬ লক্ষ টনের ১,৭৮৬টি জাহাজ।

কলকাতা বন্দর যেমন তার পার্শ্ববর্তী সমগ্র অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করে থাকে তেমন ঐ অঞ্চলের শিল্প ব্যবসার উপর বন্দরটি নির্ভরশীল। কিন্তু কলকাতা নগরের পাট-শিল্প ছাড়া অন্য শিল্প খুব কমই বন্দরটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। এর তাৎপর্য হচ্ছে কলকাতা বন্দরের উন্নয়ন, কোনো বিশেষ শিল্পের বিকাশ নয়, সমগ্র পূর্ব ভারতের বৈষয়িক কর্ম ও রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসারের সাথে জড়িত। সেই রকম, ঐ বন্দরের উন্নতি না করলে বৃহত্তর কলকাতা অঞ্চলের আর্থিক অবস্থা ক্রমে নিস্তেজ হয়ে যাবে।

জনাকীর্ণ ও শিল্পোন্নত উত্তর-পূর্ব ভারত অঞ্চলের পণ্য কলকাতা বন্দর দিয়ে আদান-প্রদান করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। সমুদ্র ও কলকাতার মধ্যে জাহাজের যাতায়াত কোনোদিনই সহজ ছিল না। ডায়মণ্ডহারবারের উপরের দিকের নদীতে চড়া ও বাধা থাকায় অনবরত পলিমাটি পরিষ্কার করবার দরকার হয়। কি রকম আকারের জাহাজ নদীপথে যেতে পারবে তা নির্ভর করে ঐসব চড়ার উপরকার জলের গভীরতার উপর। চড়া প্রভৃতি পার হবার জন্য জাহাজকে জোয়ারের অপেক্ষা করতে হয়। উলুবেড়িয়া, ডায়মণ্ডহারবার (অথবা কুলপি) ও সাগরে থেমে একটি জাহাজের নদীপথে কলকাতা বন্দরে আসতে সাধারণত ছত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ ঘণ্টা লাগে।

ইদানীং কয়েক বছর ধরে পলি জমে হুগলী নদীর গভীরতা নষ্ট হওয়ায় কলকাতা বন্দরের শ্বাসরুদ্ধ হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬১ সালের ভেতর কয়েকটি ঋতুতে প্রতি বছর প্রায় দু'ফুট করে নদীর নাব্যতা কমে গেছে। নাব্যতা এক ইঞ্চি হ্রাস পেলে জাহাজকে যেহেতু ৫০ থেকে ৬০ টন বোঝা কমিয়ে দিতে হয়, হুগলীর ক্রমিক অবনতির ফলে ঐ নদীতে জাহাজের মাল বইবার ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি।

সেই সঙ্গে, নদীর জল বেশী লবণাক্ত হয়ে যাওয়ায় নগরে জল সরবরাহের ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কলকাতা বন্দরের প্রয়োজন ছাড়াও, নগরের গৃহস্থালি ও কলকার-খানার কাজে ব্যবহারের জন্য হুগলী নদীর উপরের অংশে জল বেশী থাকা দরকার। (অঞ্চলটির কারখানাশিল্পে যে পরিমাণ জল লাগে তার শতকরা ৭৩ ভাগ আসে নলকূপ থেকে, শতকরা ১৫ ভাগ কলকাতা পৌর জলসরবরাহ ব্যবস্থা হতে যোগান দেওয়া হয়।) ফরাক্কা বাঁধনির্মাণ সম্পূর্ণ হলে অবস্থার উন্নতি হবে আশা করা যায়।

কলকাতা বন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করা সত্ত্বেও একটা নির্দিষ্ট আকারের

(১৫,০০০ টন) চাইতে বড়ো জাহাজ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না এবং ফলে মাল নিয়ে আসা বা পাঠাবার দরুন অযথা অতিরিক্ত জাহাজ-ভাড়া লাগে। নদীর অবনতির ফলে বাড়তি যে সব খরচ হচ্ছে সেগুলি হলো (১) নদী বাবহার্য রাখার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়; (২) বন্দরের পণ্য আদান-প্রদানের জন্য আগের চাইতে বেশী সংখ্যায় জাহাজের দরকার হয়েছে বলে বাড়তি যে খরচ লাগছে; (৩) জোয়ারের আশায় বন্দরে জাহাজকে অপেক্ষা করতে অতিরিক্ত যা সময় লাগে; (৪) বোঝা হালকা করবার জন্য অনেক জায়গায় জাহাজের থামার খরচ; (৫) কলকাতায় অপ্রত্যাশিতভাবে দেরি হয়ে যাওয়ায় অন্যান্য বন্দরে পণ্য না পাওয়া বা আগে নির্ধারিত কার্যসূচী পালন না করতে পারার দরুন খরচ; এবং (৬) দ্রব্য আদান-প্রদানে আগের চেয়ে বেশী খরচ পড়ায় রপ্তানী পণ্য ও আমদানী দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি; প্রধানমন্ত্র কারণে রপ্তানী বাণিজ্যের হ্রাস। কলকাতা মেট্রোপলিটান পরিকল্পনা সংস্থার একটি হিসাব অনুসারে নদীর অবনতির জন্য বাড়তি মোট খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় মোটামুটি ১৪০ লক্ষ টাকায়।

কলকাতা বন্দরে যে সব জাহাজ প্রবেশ করে বা ছেড়ে চলে যায় সেগুলির বোঝা কমিয়ে দিতে হলে এবং খাদ্যশস্য, কয়লা ও খনিজ লোহা আদান-প্রদান করতে কলকাতার দক্ষিণে নদীপথে প্রায় ৫৬ মাইল নীচে হলদিয়ায় একটা নতুন বন্দর স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতা বন্দরে এখন যে সব সুযোগ-সুবিধা আছে, কেবল তার সম্প্রসারণের জন্য গোড়ার দিকে হলদিয়া বন্দরে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হলদিয়ায় যাতে শিল্পোন্নয়নের একটা নিজস্ব দৃঢ় ভিত্তি রচনা করা যায়, এবং নতুন কর্মপ্রার্থীদের জন্য যাতে কলকাতার বদলে হলদিয়া অঞ্চলে কাজের সংস্থান করে দেওয়া সম্ভব হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এই অর্থে, বৃহত্তর কলকাতার আর্থিক অগ্রগতি হলদিয়ার উন্নয়নের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।

বর্তমানে কলকাতা বন্দর থেকে ২০ লক্ষ টনের কিছু বেশী কয়লা জাহাজে করে ভারতের উপকূলবর্তী নানা স্থানে পাঠানো হয়। হলদিয়ায় বন্দর তৈরি হলে প্রায় ২০ লক্ষ টন কয়লা বিদেশে রপ্তানী করা কঠিন হবে না। সেই রকম, কলকাতা বন্দর থেকে বর্তমানে যেখানে ছয়-সাত লক্ষ টন খনিজ লোহা বিদেশে পাঠানো হয়, প্রধানত বরাজামদা অঞ্চলের ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টন খনিজ লোহা সেখানে হলদিয়া দিয়ে রপ্তানী করা যাবে। খনিজ লোহা বইবার বড়ো জাহাজের পক্ষে কলকাতা বন্দরে প্রবেশ করা সহজ নয়। হলদিয়া বন্দরে চল্লিশ হাজার টন পর্যন্ত জাহাজ অনায়াসে যাতায়াত করতে পারবে। আকস্মিকভাবে কোনো জাহাজ হুগলী নদীতে ডুবে যাওয়ার ফলে কলকাতা বন্দরে যাবার প্রবেশপথ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পণ্যবাহী জাহাজগুলিকে পরিপূরক বন্দর হলদিয়ায় পাঠানো যাবে।

শিল্প-বাণিজ্যে কলকাতার ক্রমবর্ধমান জনগণের কাজের সংস্থান করে দেওয়ার মতো, তাদের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ নির্মাণের প্রয়োজন জরুরী হয়ে উঠেছে। শহরবাসীদের এক চতুর্থাংশ বাস করে বস্তিতে; বস্তি তাদের কর্মস্থলও অনেক ক্ষেত্রে। লোকের ভিড় ও অল্প আয়ের দরুন শোচনীয় অবস্থার ভেতর বস্তিবাসীদের জীবন-যাপন করতে হয়। অবস্থার অবনতি হয়েছে বিশেষ করে ন্যূন পৌর স্বাচ্ছন্দ্য বা সুবিধার অভাবে। বস্তি-গুলো প্রায় ক্ষেত্রে খুব অন্ধকার: ঘরের শতকরা ৭ ভাগ অন্ধকার এবং শতকরা ৬০ ভাগে কিঞ্চিত সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে; প্রায় এক চতুর্থাংশে প্রবল বৃষ্টির সময় জল জমে এবং একের তিন ভাগ সারা বছর স্যাঁতসেঁতে থাকে। সেখানকার পরিবারদের মাত্র অর্ধেকের

গৃহের ভেতর কলের জল আছে---সেই কল আবার কয়েকটি পরিবার ভাগ করে ব্যবহার করে; শতকরা ৩০ ভাগের বেশী লোকের জন্য জল যোগানের আদৌ কোনো ব্যবস্থা নেই: প্রায় এক-চতুর্থাংশ বাসস্থানে উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী অনুপস্থিত। নগর কলকাতার অধিবাসীদের দুয়ের তিন ভাগ থাকে কাঁচা বাড়িতে এবং একাধিক সদস্য-সংবলিত পরিবারদের শতকরা ৫৭ ভাগের বাস করার জন্য মেলে মাত্র একখানা ঘর। হিসাব করা হয়েছে যে, তিন লক্ষের বেশী গৃহহীন লোক কলকাতা শহরের ফুটপাতে বাস করে।

অধিক সংখ্যায় যে সব পরিবার কলকাতায় বাস করছে তাদের জন্য, পুরনো যে সমস্ত বাড়ি ভেঙে পড়ছে সেগুলোর জায়গায়, বস্তিতে যারা থাকে তাদের বাসের জন্য, যাদের আবাস সংকীর্ণ তাদের বাড়তি জায়গা দেওয়া---এ সমস্ত উদ্দেশ্যেই নতুন গৃহ নির্মাণ দরকার। কলকাতায় গৃহস্থদের সংখ্যা প্রতি বছর ৭,০০০-এর বেশী হারে বাড়ে, সুতরাং বাসের ব্যবস্থারও সমান সম্প্রসারণ বাঞ্ছনীয়। বছরে শতকরা প্রায় দুই হারে পাকা অট্টালিকাগুলির অবচয় হচ্ছে এ রকম ধরলে জীর্ণ গৃহের বদলে প্রতি বছর কমপক্ষে ৫,০০০ আবাস তৈরি করতে হবে। হিসাব করা হয়েছে যে, বর্তমানে ২০৫,০০০ গৃহস্থ রেজিস্ট্রীভুক্ত বস্তিতে এবং ১৫০,০০০ গৃহী অন্য বস্তিতে বাস করে। ৩০ বছরের ভেতর বস্তির ঐ সব বাসিন্দাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করতে হলে বছরে ১২,০০০-এর মতো বাসস্থান নির্মাণ করা প্রয়োজন। গৃহের অভাব মেটাতে গেলে তাই প্রতি বছর সবশুদ্ধ অন্তত ২৪,০০০ আবাস তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনের এই বহরের তুলনায় এখন কলকাতায় বছরে ৬,০০০-এর কম বাসস্থান নির্মিত হয় (গৃহনির্মাণ কমে এসেছে পৌর এলাকার ভেতর বাড়ি তৈরি করবার উপযোগী খোলা ও উঁচু জমির অভাবে, বাড়ি তৈরির খরচ বেড়ে যাওয়ায় এবং ইস্পাত, সিমেন্ট ও অন্যান্য মাল-মসলার যোগানে প্রায়শ সংকট দেখা দেওয়ার ফলে)। নির্ণীত এই হিসাব থেকে বাসগৃহ সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে।

গৃহনির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ বলে কলকাতার অধিবাসীদের বেশীর ভাগ উপযুক্ত বাসস্থান থেকে বঞ্চিত। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেনের পরিচালনায় ১৯৫৭-৫৮ সালের একটি তদন্ত থেকে জানা যায় যে, কলকাতার পরিবারদের শতকরা ৮৯ ভাগের মাসিক আয় হচ্ছে ২০০ টাকা বা তার কম; শতকরা ৬৬ ভাগের প্রতি মাসের আয় আবার ১০০ টাকারও নীচে। অসচ্ছল অবস্থার এই সব পরিবার তাদের আয়ের শতকরা ১৫ ভাগ গৃহের জন্য ব্যয় করতে পারে। কাজে-কাজেই ঐ পরিবারদের শতকরা ৬৬ ভাগ মাসে ১৫ টাকা এবং আরো শতকরা ১৮ ভাগ মাসিক ৩০ টাকার বেশী বাসাভাড়ির উপর খরচ করতে অক্ষম।

বাড়ি তৈরি করতে এখন যা খরচ লাগে তাতে আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য বা সুবিধা আছে এরকম দেড়খানা ঘর অর্থাৎ প্রায় ২৩৮ বর্গফুট আয়তনের মেঝে-বিশিষ্ট গৃহ নির্মাণ করতে কমপক্ষে ৫,৭০০ টাকা পড়বে। জমির খরচ এবং মূলধনের উপর একটা ন্যায্য আগম ধরলে, ঐ রকম বাড়ির ন্যূন ভাড়া হবে মাসে ৭০ টাকার মতো। স্পষ্টত, নতুন বাড়ীগুলি কলকাতার পরিবারদের অধিকাংশের সামর্থ্যের বাইরে। ফলে, স্বল্প আয়ের বেশীর ভাগ পরিবারদের পুরনো জীর্ণ বাড়িতে অথবা বস্তিতে ঘোঁষাঘোঁষি করে বাস করতে হয়।

বাসগৃহ সমস্যা কেবল অল্প আয়ের পরিবারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যে সব গৃহস্থদের প্রতি মাসের আয় ২০০ এবং ৭৫০ টাকার ভেতর, তাদের মাত্র একের পাঁচ ভাগের নিজেদের বাড়ি আছে; মাসিক ৭৫০ টাকার বেশী আয়ের গৃহীদের শতকরা ৬০ ভাগ ভাড়া-

করা ফ্ল্যাটে থাকে। কলকাতার সমস্ত পরিবারদের শতকরা মাত্র ৭·২ ভাগ নিজের গৃহে বাস করে।

অল্প ও মাঝারি আয়ের পরিবারদের জন্য কলকাতার ভেতর যদি আবাসের বন্দোবস্ত করতে হয় তাহলে বহুতল-বিশিষ্ট ইমারতের এক-একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ অংশ বা ফ্ল্যাট তাদের কেনবার সুবিধা করে দিতে হবে। মরগেজ ঋণের সাহায্যে দীর্ঘ-মেয়াদী ইজারার ভিত্তিতে যাতে ঐ সব পরিবার ফ্ল্যাটের মালিক হতে পারে সেরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সব চেয়ে ভালো হয়। (নিজের জমি না থাকলে বাড়ির জন্য বর্তমানে জীবন-বীমা কর্পোরেশন থেকে মরগেজ বা বন্ধক ঋণ পাওয়া যায় না। শহরের জমি দুর্মূল্য হওয়ায় অনধিক আয়ের পরিবারদের পক্ষে ঐ শর্ত পূরণ করা সম্ভব নয়।)

কলকাতা শহরের বাইরে গৃহ নির্মাণের উপযোগী স্বল্পমূল্যের জমি পাওয়া গেলে কম ও মাঝামাঝি আয়ের লোকদের জন্য ব্যবস্থা করা সহজ হবে। সেক্ষেত্রে বর্হিদেশ অঞ্চল থেকে শহরে যাতায়াতের সুবিধা করে দেবার জন্য সরকারী সাহায্যের দরকার হতে পারে। নব-নির্মিত অঞ্চলে অল্প আয়ের লোকদের থাকার বন্দোবস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার শিল্পোন্নয়ন, সেই সব অধিবাসীদের জন্য কর্মকেন্দ্র স্থাপনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

উপযুক্ত পরিমাণের অর্থ নেই বলে সরকারের পক্ষে বাসগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে বিশেষ অর্থ সাহায্য করা সম্ভব নয়। কলকাতা অঞ্চলের গৃহসমস্যার সমাধানের জন্য শহরবাসীদের তাই নিজেদেরই বেশীর ভাগ অর্থের সংস্থান করতে হবে।

বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন এবং বস্তি উচ্ছেদের জন্য ১৯৫৮ সালে আইন পাশ করা হয়েছে। ঐ আইন অনুসারে মানুষের বাসের অনুপযুক্ত কুটিরগুলি ভেঙে দেওয়া যেতে পারে এই শর্তে যে, বস্তির এক মাইল ব্যাসার্ধের ভেতর (বস্তির বহু ব্যক্তি তাদের গৃহের খুব কাছাকাছি অঞ্চলে কাজ করে) বস্তির লোকদের জন্য বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বস্তির এক মাইলের ভেতর পরিমিত খরচে উপযুক্ত ফাঁকা জমি পাওয়া যায়নি বলে কলকাতায় বস্তি তুলে দেওয়ার কাজ বিশেষ এগোয় নি (বস্তির লোকদের বাড়ি তৈরির জন্য যে সরকারী অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় তা-ও যথেষ্ট নয়)। বস্তি উচ্ছেদের বড়ো কোনো পরিকল্পনা বর্তমানে গ্রহণ করা সম্ভব নয়; যে সব বস্তি নগরের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে কেবল সেগুলিই তুলে দেওয়া যেতে পারে। এখনকার মতো তাই সেখানকার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পরিস্রুত জল, স্নানাগার ইত্যাদির ব্যবস্থা দ্বারা বস্তির দ্রুত উন্নয়নের চেষ্টা করা ছাড়া উপায় নেই।

দেখা যাচ্ছে যে, নাগরিকদের কল্যাণ সাধনের জন্য আবশ্যিক সুযোগ-সুবিধার দ্রুত সম্প্রসারণ কলকাতার একটি জরুরী প্রয়োজন। যে অবস্থার মধ্যে এই নগরের অধিকাংশ লোক জীবন-যাপন করে তার উন্নতি যেমন বাঞ্ছনীয়, কলকাতায় বর্তমানে যে সব সুবিধা আছে সেগুলি বজায় রাখা বা তাদের ক্রমিক অবনতি নিবারণ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

নগর-কলকাতার সংস্কার ও উন্নতির জন্য তার আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। নাগরিক জীবনের উন্নতিবিধান করতে যেমন রাজস্ব লাগে, উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণে তেমনি মূলধনের দরকার হয়। শিল্পের ক্রমবিকাশ ও বাণিজ্যের প্রসার দ্বারা নাগরিকদের আয়ের বৃদ্ধিসাধন না করলে তাদের পক্ষে কলকাতার পরিকল্পনামূলক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা কঠিন হবে। কলকাতার সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য তার বৈষয়িক অগ্রগতি তাই বিশেষ মনোযোগ ও প্রচেষ্টার অপেক্ষা রাখে।

মুখোশ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ছুটির দিনে সকালবেলাটা বসবার ঘর সামনের দু'তিন হাত ঘাস সুব্রতকেই ছেড়ে দিতে হয়। শশাঙ্কশেখর তখন এক তলার নিজের ঘরেই চা খান, খবর কাগজের খোঁজ না নিয়ে জগদীশবাবুর পকেট-গীতায় মন দেন। চা খেতে যদি বা উঠে চেয়ারে গেলেন, গীতা-পাঠের বেলায় শয্যায়ই এসে বসেন। কারণ, শয্যা থেকেই দেয়ালে ঝোলান শয্যা-সঙ্গিনীর তৈল-চিত্রটি চোখ-বরাবর দেখা যায়। কারণ, গীতাটি তাঁর গতাসু শয্যাসঙ্গিনীরই পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সের একমাত্র মনোসঙ্গিনী ছিল এবং প্রায়ই তখন তিনি স্বামীকে অনুরোধ করতেন শ্লোকগুলো বই-এর ব্যাখ্যার চাইতে ভালো করে তাঁকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে। তাঁদের সময় সহধর্মিনীরা স্বামীর মুখেই তো নিষ্কাম কর্মের কথা শুনতে চাইতেন। এখনকার বিবাহিতা স্ত্রীরা শয্যাভাগিনী হতে পারেন কিন্তু সহধর্মিনী তো নন।

দেয়ালে যিনি শুধু ছবি নন, আকাশের অরুন্ধতী নক্ষত্রের মতোই সত্য—এখন তাঁর উদ্দেশ্যেই শশাঙ্কশেখর গীতা পাঠ করেন যেহেতু তাঁর জীবিতাবস্থায় সতীর অনুরোধ পতি রক্ষা করেন নি। এখন নিষ্কাম কর্ম বুঝতে এবং বোঝাতে কোনো অসুবিধাই ছিল না। আর বস্তুত, নিষ্কাম কর্ম ছাড়া এখন তিনি আর কী-ই বা করছেন? তিনি শুনেছেন, ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশনেও তাঁর নাম নেই। না থাক্! এই যে, তার পরও, জওহরলালের মৃত্যু-খবরটা পাড়ায় রটাতে ছুটলেন তিনি, দেববাবুর কাছে, বীমাবাবু অসুস্থ বলেই তাঁর কাছে নয়—তা কি নিষ্কাম কর্মের এলাকায় পড়ে না?

আজ অবশ্যি অবিনাশী আত্মার খবরই নিচ্ছিলেন জজবাবু, যখন জওহরলালের দেহ পঞ্চভূতে মিশে গেছে। আত্মার প্রতীক শেষ ইচ্ছা-টিচ্ছা কিছু নয়, যেটা খবরের কাগজের পরিবেশে তিনি ভাবতে পারেন। বিশুদ্ধ আত্মারই খবর নিচ্ছিলেন তিনি গীতায়:

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

আত্মা কি হত্যাকারী হতে পারে? না। হত হতে পারে? না। যারা আত্মাকে জানে না তারা এরকমই মনে করে! আত্মা মারেও না, মরেও না।

তার মানে, খুনীর আত্মা খুনী নয়, আমি যে খুনীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি আমার আত্মাও বিচারক নয়। খুনীর আত্মাও মরবে না, আমার আত্মাও তাকে মারে নি। অবসর-প্রাপ্ত বিচারপতি শশাঙ্কশেখর কেমন যেন বিপন্ন-বোধ করলেন। যেহেতু তিনি রূপনারাণের কূলে জেগে ওঠেননি তার জন্যেই এখনকার জাগ্রত অবস্থাটাকে তাঁর স্বপ্ন বলে মনে হল। তিনি যদি আত্মা হয়ে থাকেন তাহলে তিনি বিচারক নন, অতীতেও বিচারক ছিলেন না। তবু তিনি নিজের পিতার বিচার করেছেন, খুনীর বিচার করেছেন, সুপ্রিয়র বিচার করে চলছেন! স্বপ্নেই এসব হতে পারে। কিন্তু সত্যে কি, তাই বলে, তিনি জেগে উঠলেন? তাহলে আর বিপন্ন-বোধ করবেন কেন?

কখন যে গীতার পৃষ্ঠা থেকে তার আঙুলগুলো সরে এসেছে এবং বইটা বন্ধ হয়ে গেছে, তিনি তা বলতে পারবেন না। যদি তাকে আত্মস্থ বলা যায়, আত্মস্থ হলেন তিনি

সোমা এসে যখন ঘরে ঢুকল।

সোমা-ই সম্প্রতি 'বাবা'র ঘরে আসতে সুরু করেছে। সুব্রত আসত—এখনও আসে, বাবা যখন তাঁর ঘরে। মনিকা আসে না। মলুয়া আসে না। মহুয়া আসত, আসে। সুপ্রিয় আসে না। সোমা আসছে। আসছে, যখন তাদের ঘরে সে একা। সুপ্রিয় নেই। থাকে বা কতোক্ষণ? ঘুমের সময়টা আর তার আগে ও পরে এক-এক ঘণ্টা। বাড়ি থাকলেও এ-রুটিনের বাইরে এক মিনিট বেশি নয়। মলুয়ার পড়ার ঘরেই আড্ডা তার।

শ্বশুরকে 'বাবা' ডাকতে হয় জানত সোমা—বিয়ের আগেই জানত—শান্তিনিকেতন থাকতেই। কিন্তু সে-'বাবা'র ঘরে যে আসতে হয় তা কি জানত? সে যখন শান্তিনিকেতনে, তখন রবীন্দ্রনাথ নেই। মা তাকে বলে দিয়েছিলেন? না। বাবা? বললেও, মনে নেই। মণিকা তো বলেই নি—সুব্রতও না। সুপ্রিয় কথা বা বলে ক'টা—আর এমন বাজে কথা বলবে! তারই বোধহয় মনে হয়েছিল, 'বাবা'র ঘরে তার আসা দরকার। 'বাবা' এমন এক চোখে কী এক প্রত্যাশায় তাকিয়েছিলেন প্রথম আশীর্বাদ করে, তারপর কি আর কাউকে বলতে হয়? এই বিশেষ ঘটনায় সোমা বোধহয় মেয়েদের স্বভাবের সাধারণ সূত্রটা ধরতে পেরেছিল। গল্প-করা নির্বোধ কৈশোরে যেম্নি তাদের আপত্তি নেই, তেম্নি সহজ তাদের চঞ্চল তারুণ্য, তেম্নি মা হওয়া, মাতৃত্ব পাওয়া। যখনকার যা শরীরই তাদের মনকে শিখিয়ে দেয়, তা-তা-ই করে যায় মেয়েরা। অন্তত সোমার মতো মেয়েরা।

—এসো মা, শশাঙ্কশেখর পুত্রবধূকে সাদর আহ্বান জানালেন,—বোসো।

—বসব কেন? দাঁড়ানোই তো ভালো!

—তুমি তো আর আসামী নও। বহুদিন পর জজবাবু 'আসামী'-শব্দটা মুখে আনলেন এবং এ-শব্দ উচ্চারণের পর কস্মিনকালেও যা করতেন না তা-ই করলেন আজ। প্রচুর হেসে উঠলেন।

কিন্তু সোমা তো জানতে পেরেছে তার স্বামী যে অবসরপ্রাপ্ত জজের কোর্টেও আসামী। স্বামী তার নিজের কাছে তা হোক কিন্তু অপরের চোখে তা-ই হবে অন্তত সোমার মতো স্ত্রী তাতে দুঃখিত না হয়ে পারে না!

—কী ব্যাজার হয়ে গেলে? তখনও রীডিংগ্লাস ছিল শশাঙ্কশেখরের চোখে। সোমার ঠোঁটের আশেপাশে ছোট, আবছা রেখাগুলোও তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন।

—কই, না তো! একটু হাসল সোমা।

—বাবু বেরিয়ে গেছেন?

সুপ্রিয়? তা তো গেছেই। কিন্তু কোথায় সোমা তা জানে না। মলুয়ার ঘরে উঁকি দেয়নি সে। সামান্য একটু ঘাড় কাৎ করলে সোমা।

—মলুয়া গেছে সঙ্গে?

—জানিনে। কিন্তু কাল তো বলেছিল মলুয়া খুব ভোরেই গীতার বাড়ি চলে যাবে!

—খুব ভোর হয়েছে তার এখন?

আবার ঠোঁটে সেই অল্প হাসি দেখা গেল সোমার। বিদ্যুতে বারবার চমকে-ওঠা মেঘের মতোই তো তরুণীরা হয়।

—গীতা বুঝি সেই মেয়েটি, কাল যে এসেছিল! শশাঙ্কশেখর কি একটি মুগ্ধ বা মধুর মুহূর্ত স্মরণ করলেন? তাঁর গলার পরিবর্তন হয়ে গেল। চড়া থেকে খাদে।

—হাঁ। খুব মিশুক, চটপটে।

—এখনকার মেয়েরা তো তা-ই হয়।

শশাঙ্কশেখর মনে আনতে চেষ্টা করলেন, এখনকার মেয়েদের নিন্দা তিনি কোথাও করেছিলেন কি না, লেকের বেঞ্চিতে, দেববাবুর কাছারীঘরে, উপাধ্যায়ের বসবার ঘরে, বীমাবাবুর দোতলার বিছানায় বসে কিম্বা এঞ্জিনীয়র বাবুর গোলবারান্দায়? না, তেমন-কিছু নয়। বরং লেকের ধারে যুবকদের মুখেই অশালীন কথা শুনেছেন এখনকার মেয়েদের সম্পর্কে। 'ওগো কাঞ্জিভরম তুমি পৌঁছিলে অসম্ভ্রমে...' এক যুবকের মুখে শুনেছিলেন তাঁরা লেকের বিকেলে পদ্যটা। মনে আছে। তাঁর সহকর্মী কবির রোডের ঘোষবাবু ঘোষণা করেছিলেন, 'কাঞ্জিভরম্' মানেটা জানেন তো মশায়? কাঞ্জিভরম্ টিস্যু—শাড়ি, শাড়ি! পদ্যের মানেটা উপলব্ধি করে বেঞ্চির যে-ক'টা বাঁধানো দাঁতই চিকিয়ে উঠুক—ঠিক আজকের মতোই বিপন্ন বোধ করে শশঙ্কাশেখর বাড়ি এসেছিলেন এবং মলুয়াকে সেদিন বাড়িতেই দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন,—তুমি কাঞ্জিভরম টিস্যু ব্যবহার করো না তো? —ও-নাম তুমি জানলে কী করে দাদু? কৌতুকে হেসে উঠেছিল মলুয়া।

নিন্দা তিনি করেন নি কোথাও বসে—তবে প্রশংসাও করেন নি। এখন প্রশংসা করছেন। সোমা তাঁর ঘরে এসে কুশল জানতে চাইছে পর থেকে প্রশংসা করছেন সোমাকে। মনে-মনে। এবং মুখ ফুটে সুব্রতর কাছে—লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে লক্ষ্মী জুটিয়ে আনলাম—জানো। ছোট বৌ যে লক্ষ্মী তা শুনল সুব্রত কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া যে কে ঠিক বুঝতে পারল না। বাবা স্বয়ং, না সে নিজে, না সুপ্রিয়।

কিন্তু শশাঙ্কশেখর 'লক্ষ্মীছাড়া' কথাটা সমস্ত পরিবারেই চারিয়ে দিয়ে কথাটা বলেছিলেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর তার সংসার লক্ষ্মীছাড়া হল না তো কী? তিনি যেমন ছিলেন, মণিকা কি তেমন হতে পারল? নতুন বৌ যখন, সে-ও অবশ্যি প্রণাম করতে আসত ভোরবেলা—তা-ও শাশুড়ির নির্দেশে। তারপর তিনি গত হলেন, সুব্রত বিদেশ গেল—মলুয়া কি তখন জন্মেছিল,—না কয়েকমাস পর?—সুব্রতও এরোড্রোম ছাড়ল, মণিকাও বাপের ঘরে গিয়ে যেন বাঁচল। সোমা কেমন হবে এখনো ঠিক জানেন না শশাঙ্কশেখর। কিন্তু আজ, এখন, তাকে মেয়ের মতো ভাবতে মনে একটুও ইতস্তত ছিল না। তাঁর।

সোমা তো এখনকারই মেয়ে—মলুয়ার চাইতে বড়ো জোর তিন-চার বছরের বড়ো হবে—তাই এখনকার মেয়ের বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ মন্তব্য না শুনে খুশীই হল সে। মলুয়া-গীতাকে তার নিজের ভালো লাগুক আর না-ই লাগুক।

—মলুয়া বলছিল, গীতা নাকি আপনাদের উপাধ্যায় মশায়ের কী আত্মীয়া হন। পরিচ্ছন্ন হেসে বললে সোমা।

—তাই না কি? তাহলে তো পদ্মনাভকে জিজ্ঞেস করতে হয়! শশাঙ্কশেখর উৎসাহী হলেন আলাপে। আগেকার চাইতে একটু বেশি উৎসাহী।

—আপনি পড়ছিলেন? শ্বশুরের কোলে গীতা-তে চোখ পড়ল সোমার। মাথা নুইয়ে নিলে—কারো উপর শ্রদ্ধায় নয়, পড়ায় ব্যাঘাত করবার সঙ্কোচে।

—পড়ার যোগ্যতা কি আছে, উল্টে পাল্টে দেখছিলাম।

বিনীত কথাও বোধহয় বাঙ্ময় তপের অন্তর্ভুক্ত গীতা-পাঠে যা বলতে অভ্যাস করছিলেন শশাঙ্কশেখর। নইলে, ইচ্ছে করলেই তাঁর মনে পড়বে, তিনি যখন মৈমনসিংহে সাবজজ, এজলাসে বসেই রায়ে চোখ বুলুচ্ছিলেন একদিন, সরকারী উকীলবাবু—যথেষ্ট পদস্থ ব্যক্তি, ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন,—হুজুর কি রায় দেখছেন? ব্যাঘাতে বিরক্ত

হলেন সাবজজবাবু—মুখ তুলে বললেন প্রশ্নকর্তাকে,—না, চিত্রাঙ্কণ করছি! উকীলবাবু নিশ্চয়ই ফ্যাকাশে হলেন কিন্তু তাঁর মুখে তাকাবার প্রবৃত্তি ছিল না সাবজজবাবুর। কিন্তু আজ? সোমা যদি জেরাও ধরে কোনো অপ্রীতিকর কথা বলবেন না শশাঙ্কশেখর। গীতার 'বাঙ্ময় তপ' ছাড়া এ আর কী?

প্রায় জেরাই ধরলে সোমা,—বাঃ, আপনারই যোগ্যতা নেই?

—ছিল—ছিল তোমার শাশুড়ি,—দেয়ালে তাকালেন এবার শশাঙ্কশেখর,—শুচিস্মিতা। যোগ্যতা এঁদের ছাড়া আর কার হবে!

এ-ধরনের কোনো ভাব মনে নিয়ে শাশুড়ির দিকে আগে তাকায়নি সোমা, মণিকা যেদিন প্রথম এই ছবিকে প্রণাম করাতে নিয়ে এসেছিলেন তাকে এ-ঘরে সেদিনও না। এখন তাকালো এবং মনে হল সোমার সে একটি পবিত্র, সরল মুখ দেখছে—যেমন ঘুমিয়ে থাকলে সুপ্রিয়কে অনেকটা দেখায়।

কিন্তু পবিত্রতা নিয়ে শশাঙ্কশেখর আর সোমা পাঁচ সেকেণ্ডও থাকতে পারলেন না, বাড়ি মাথায় করে এসে ঢুকল মহুয়া,—জানো দাদু—কাকিমা—শোনো—এইমাত্র দিদি টেলি-ফোন করলে, বাড়ি আসবে না। গীতাদির সঙ্গে বৈজয়ন্তীমালার 'ফুলো কি সেজ' দেখতে যাবে! কেমন ফাঁকি বুঝতে পারছ?

—ফাঁকি? বুঝতে পারছিলেন না শশাঙ্কশেখর।

সোমা হাত বাড়িয়ে মহুয়াকে টেনে এনে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইল। মিশল মহুয়া এক মুহূর্ত কিন্তু ফাঁকির নমুনা বোঝাতে আলগা হয়ে বললে,—কাল আমি বলে রাখলাম, বৈজয়ন্তীমালা দেখব—দিদি রাজি হল। আজ, গীতা না ফিতা কে—তার ওখানে গিয়েই প্ল্যান পাল্টে দিলে!

হাসলেন শশাঙ্কশেখর,—গভর্নমেণ্টই প্ল্যান পাল্টান—তবে গভর্নমেণ্ট কি না শামুকের গতিতে পাল্টান—পাঁচ বছর পর-পর! এ তো মলুয়া— ক'ঘণ্টা পর পাল্টালো?

—ন্-না! দাঁড়ানো নাচের ভঙ্গীতে লাফাতে সুরু করলে মহুয়া,—কেন আমি বৈজয়ন্তীমালাকে দেখব না!

সোমা নীচু হয়ে মহুয়ার থুতনিতে হাত দিয়ে বললে,—মাকে বলেছো?

—বলি নি-ই আবার—ঠোঁট দুটো মুখের ভেতর থেকে বাঁকা হয়ে গেল মহুয়ার, অনেকটা ফোটা গোলাপের পাপড়ির মতো।

শশাঙ্কশেখর উঠে দাঁড়ালেন,—বাবা কোথায়? এখনও কাগজ পড়ছেন।

—গিয়ে দেখতে পারো না? জজের উপর বিরক্ত হয়ে মহুয়া চলে গেল।

সোমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন জজবাবু,—ঠিক আমার মার মেজাজ পেয়েছে!

সোমা নিজের মেজাজটার কথাই ভাবলে। বলা যায়, বিচার করলে। মেজাজ সে দেখাতে পারছে না। দেখালে তো দেখাত সুপ্রিয়রই উপর। মলুয়া তো ঘরের মেয়ে—মলুয়া ছাড়াও গীতা-ফিতার মতো আরো অনেক মেয়ে যে সুপ্রিয়র আছে, তা কি সোমা বুঝতে পারছে না? খুবই পারছে। ভেবে তার মন খারাপ হতে পারত, মেজাজ দেখাতে পারত। কিন্তু কিছুই তার হয় না, কিছুই সে করতে পারে না। সন্দীপকেই ভাবে সে তখন—শান্তিনিকেতনের বিদ্যাভবনেই চোখ চলে যায় তার। দেখা হবে কি আর কোনোদিন? যেম্নি অলকের সঙ্গে দেখা হল? দেখা হলে তো এম্নি চমকে উঠবে সে, অবাক হবে। তারপর যদি কথা-ই বলে কী বলবে সোমা? সন্দীপ কী জিজ্ঞেস করবে? 'ভালো আছো?'

কেমন চোখ-মুখ হবে তার তখন? শান্তিনিকেতন থেকে যেদিন চলে আসবে সেদিন যেম্নি সে তাকিয়েছিল, বিষণ্ণ, তেম্নিই তো তাকাবে? যেন সন্দীপের প্রশ্নটা এখুনি শুনল সোমা। শুনল এবং ভাবল কী উত্তর দেবে সে। ভালো আছে কি সোমা? ভালো আছে। বাবার কাছে বলেছে সে, মার কাছে বলেছে, ভাই-বোন-আত্মীয়দের কাছে বলেছে। এখানেও সে দেখিয়েছে সে ভালো আছে। 'বাবা' বলেছেন,—মণিকার মতো আটপৌরে হয়ে থেকো না মা, বাড়ির বৌদের ওতে ভালো দেখায় না! রঙীন শাড়ি পরবে—ভালো ভালো রঙের। তা-ই পরে সে বাবার ঘরে আসে। দেখায় সে ভালো আছে। কিন্তু নিজেকে সে দেখাতে পারে কি, সে ভালো আছে? ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় একা দাঁড়িয়ে বলতে পারবে কোনোদিন,—সোমা, তুমি ভালো আছ—? জানে না। দাঁড়িয়ে এ-কথা সে আনেনি মনে, আনবে না। কিন্তু এখন? সন্দীপের জিজ্ঞাসায় কী বলবে সোমা? কিছুই না। শুধু সন্দীপের মুখের বিষণ্ণতাটা নকল করে তার মুখ চুপ করে থাকবে। চোখ কাঁপবে না, ঠোঁটও না। পাথর? কী জানি, পাথরই হয়ে যেতে হবে কি না তাকে। ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে মেঝে থেকে যখন চোখ তুলল সোমা, শশাঙ্কশেখর আর ঘরে নেই।

কিছুই করবার নেই এ-বাড়িতে। এখন কী করবে? কিছুই না।। মণিকার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে ছায়ার মতো। দিদি যদি দয়া করে দু'একটা কথা বলেন, সে-ও বলবে। তা-ও ছোট-ছোট কথা। অল্প কথা। দাদার পথে কখনো পড়লে দাদা তাঁর অপিসের হাসিই বোধহয় হেসে জিজ্ঞেস করেন,—ভালো? যেম্নি ফ্যামিলি-ফিজিসিয়ান মাঝে-মাঝে এসে রোগী পরিবারকে জিজ্ঞেস করেন। মলয়া? মলয়া বোধহয় সুখই পায় না তার সঙ্গে কথা বলে। বিয়ের আগে যে ভালোবাসেনি, স্বামীকেই প্রথম ভালোবাসতে এসেছে সে বোকা মেয়ের সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে? এই তো মলয়ার ধারণা।

সোমাকে কি তাহলে বোকা-বোকা দেখায়—পাথর নয়? কিন্তু পাথরই তো সে হতে চায়! 'কী স্বপনে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি—অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি—' পাথর যে-স্বপ্ন দ্যাখে সে স্বপ্ন দেখতে পারবে না সোমা? সোমপায়ী ইন্দ্রের ধর্ষণ—ধর্ষণ —ধর্ষণই চলবে দিবা-রাত্রি?

পটে-লেখা দেয়ালের মহিলার দিকে তাকালো সোমা। কী ভীষণ ময়লা দেখাচ্ছে তাঁর মুখ—কী ভীষণ...

উনিশ

খবরের কাগজ দেখা হয়ে গিয়েছিল সুব্রতর। অভিজিৎ রায়ের লেখাটার সুখ্যাতি সে-ই বাড়িতে প্রচার করেছে। বাবাকে যখন বলছিল, তখন সুপ্রিয় বেরোচ্ছে। প্রাইভেট সেক্টরের প্রচার সচিব নিশ্চয়ই পারিক চয়েসের কথা ভাবছিল—যা শুধু তার পেশায় এলেই ভাবতে হয় তা নয়, সাহিত্যিকদের ভাবতে হয়, রাষ্ট্রনেতাদের ভাবতে হয়, মান-মর্যাদা-ভোট কুড়োতে ভাবতে হয়। কিন্তু কী আশ্চর্য, যে রাষ্ট্র আজ পারিক সেক্টার তৈরী করে তুলছেন—সেখানে প্রধান মন্ত্রী প্রাইভেট চয়েসে তৈরী হবে। মোরারজি না শাস্ত্রী, তা বলবেন সপার্ষদ কামরাজ! সব জায়গায়ই বিপরীত চাল! ফলে, আমরা যেখানে আছি সেখানেই। নিউট্রেলাইজ্‌ড্‌ না হয়ে উপায় কী!

এ-ধরনের ছোট-খাট ভাবনা শেষ না করতেই শশাঙ্কশেখর এ-ঘরে এলেন। সুব্রত

উঠে দাঁড়াল। এখন বাবার এই ঘর এবং খবরের কাগজ। সচ্চিদানন্দবাবু সুস্থ থাকলে আসবেন—সুমিত্র তো আজকাল আর তার বন্ধু নয়, বাবারই বন্ধুব্যক্তি—সে-ও আসবে রবিবার সকালটা কাটিয়ে যেতে! 'পারিক চয়েস'টা হয়তো সরে যাচ্ছে সুমিত্রর উপর থেকে, নইলে রবিবার সকালে তো জ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকের বাড়ি কনিষ্ঠদের তীর্থস্থান হবার কথা। আড্ডা আর বসে না বাড়িতে, 'প্রাইভেট চয়েসের'ই তাই ভক্ত হয়ে উঠছে পদ্মবিভূষণ ক্রমে!

কিন্তু শশাঙ্কশেখর খবরের কাগজ খুঁজলেন না। বললেন,—মলুয়ার টেলিফোন তুমি ধরেছিলে?

—না। হাসল সুব্রত,—টেলিফোন তো আজকাল মহুয়াই ধরছে—সব টেলিফোন।

শশাঙ্কশেখর হাল্কা হয়ে গেলেন,—দাও বৌটিকে টেলিফোন-গার্ল করে!

সুব্রত হাসতে লাগল।

শশাঙ্কশেখর বসলেন। খবরের কাগজের দিকে একপলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। স্পর্শ করলেন না। 'অ্যাশ ওয়েডনেসডে'র খবর তিনি জানেন। তাঁর মনে হল, অন্তত তাঁকে দেখে ভাববার কথা যে তাঁর মনে হচ্ছে, কাগজটাতে যেন জওহরলালের চিতাভস্ম লেগে আছে। হয়তো মনে-মনে তিনি ইদানীংকার পড়াশুনো থেকে 'পিতৃমেধে'র মন্ত্রও উচ্চারণ করলেন: 'হে অগ্নে যঃ প্রেতঃ তে আহুতঃ চিতৌ মন্ত্রেণ সমর্পিতঃ।' যেন একটা দেশলাই জ্বেলে কাগজটা আগুনেও সমর্পণ করতে পারেন তিনি।

কিন্তু সুব্রত বললে,—অভিজিতের প্যারাগ্রাফগুলো পড়বেন, বাবা। সচ্চিদানন্দবাবু নিশ্চয়ই আসছেন আজ!

—জানো, আজ এম্নিতেই বেশ একটা আনন্দ অনুভব করছি! হাসলেন শশাঙ্কশেখর। কেন তা না জানলেও সুব্রত শুনতেই পাচ্ছিল, বাবার গলা আজ বেশ হাল্কা। বললে সে,—ছুটিছাটার দিনে আমাদেরও হয় ও-রকম।

—আমার তো রোজই ছুটি কিন্তু রোজ যেমন নয়, আজ যেন তেমন একটা-কিছু মনে হচ্ছে!

—তার মানে হয়তো প্রেশারটা থেকে কিউরড হয়ে গেছেন।

—হতেও পারে!

কিন্তু প্রেশার কমুক আর আনন্দের সাগর থেকে বানই আসুক—তার কারণটা জজবাবু বিলক্ষণই জানেন। স্ত্রীসঙ্গ। যে-স্ত্রী গীতাপাঠ শুনতে চেয়েছিলেন তাঁর মুখে, তাঁকে আজ গীতাপাঠ শুনিয়ে এসেছেন তিনি। আজই যেন প্রথম। আজই যেন প্রথম শুনলেন স্ত্রী। আজই যেন তিনি শোনাতে পারলেন। নইলে ও-রকম স্বপ্নাচ্ছন্নতা হবে কেন তাঁর! সোমাকে একটু বেশি কেন ভালো লাগবে? এমন কি হয়তো মলুয়াকেও।

বাবা সুস্থ আছেন, শ্যাম্পেনের মতো ছুটির একটা মৃদু নেশা যেন সচকিত করে তুলল সুব্রতর স্নায়ু। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া যায় বেশ। পথের হাওয়ায় গোলাপী হয়ে উঠবে মন। নিউ মার্কেটে কি এখন গোলাপ পাওয়া যাবে। ফুল কেনে না সে অনেকদিন। কবে কিনেছিল? সে এখানে নয়। লন্ডনে। বিদেশিনীর মুখটা ঠিক মনে পড়ল না। তার এখনকার হায়াসিন্থ গার্লের মতো কি? ওরা সব দেশেই এমন একরকম হয়! ভাবনায় আর বেশি এগুলো না সুব্রত। বাবার সামনে এগোতে চাইল না মন। বললে,—আপনি একটু ভালো বোধ করলে, ঘুরে আসতাম!

খারাপ বোধ করলেও শশাঙ্কশেখর যা বলতেন তা-ই বললেন,—যাবে। বেশ তো

যাও। ছুটির দিন তো আউটিং-এর জন্যেই!

হাসি মুখে রাম দশরথের কাছ থেকে বনে যাবার অনুমতি নিয়ে গেল। নিউ মার্কেটের ফুলবনে। পার্ক ম্যানসন। ফ্ল্যাট নম্বর?

কিন্তু অচিরেই দৃশ্যে ভরত প্রবেশ করল। অলকের অলকাপুরী থেকে ফিরে এসেছে সুপ্রিয়। বাবাকে টেলিফোনের পাশে দেখে সুপ্রিয় খুশী হল না।

কিন্তু সুপ্রিয়কে দেখে আজ শশাঙ্কশেখর মুখ ফিরিয়ে নিলেন না। বরং এতোক্ষণ যে খবরের কাগজটাকে অচ্ছুৎ অশুচি মনে করেছিলেন তা হাতে টেনে নিয়ে উঠি-উঠি করে বললেন,—বসবে এ-ঘরে? বোসো?

আঙুলে বাঁ কানের লতিটা ঘষে ঘাড় নোয়াল সুপ্রিয়। কিছু বললে না।

শশাঙ্কশেখর উঠে দাঁড়ালেন, যেতে যেতে বলে গেলেন,—আমি ঘরেই আছি। দেববাবু এলে পাঠিয়ে দিও।

'হুঁ' 'হাঁ' কিছু না বলে সুপ্রিয় এসে টেলিফোনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডায়াল ঘুরিয়ে যে নম্বর নিল তা গীতার।

—হ্যালো। গীতা, না মলয়া? সত্যি, চিনতে পারছিনে। টেলিফোনে তোমাদের সবার গলা এম্নি একরকম আসে! কী? মলয়া পাশেই আছে? শোনো গীতা, আজ বিকেলে তুমি আসছ তো? না-না, ওসব বুঝিনে—বৈজয়ন্তীমালা দেখতে চাও, তো রক্তমাংসে দেখিয়ে দেব! বাঃ, আলাপ থাকবে না, বালিগঞ্জ পাড়াই তো আমার টারগেট! ভার্স ড্রামাটা নিয়ে এসো—নাটকারিণীকে শুক্লা গাঙুলির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। সে কে? তুমি কি কলকাতা আছো, না বোম্বেতে! শুক্লা গাঙুলিকে চেনো না? ও তোমাদের সিনেমার আকাশের তারকা-ফারকা নয়। চৌরঙ্গীর আকাশের নিয়ন-সাইন! অথচ—চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা! পদ্য। আমার হবে কেন? নাম? কেন বলব? ভার্স ড্রামা লিখছ, পূর্বসূরীদের নাম জানো না? জানো? এলিয়ট? না-না, এলিয়ট রোড জানি—কাব্যের ট্রেন রবীন্দ্রনাথের স্টেশনে থেমে গেছে আমার। কী? মলয়া হাসছে? পড়েছে না কি ও এলিয়ট? না। তবে? এই গীতা—শোনো। জরুরি খবর। হাঁ, আসবারই খবর। আসতেই বলছি। শুক্লাকে না-ই দেখলে—তোমার জামাইবাবুকে দেখতে এসো। কেন। বেশ, বলব না। কিন্তু ব্যাপার কী? কাল না গেলে ওখানে? তাহলে বলছ কেন জামাইবাবুর কথা না বলতে। আচ্ছা—আমার এখানেই এসো, শোনা যাবে। রাত হয়ে গেলে আসতে ক্ষতি কী? তোমায় পৌঁছে দেব। ট্যাক্সিতে কেন? দাদার গাড়িরও তো ছুটি আজ। তাহলে এই কথা।

ফোন রাখল সুপ্রিয়। কিন্তু এখন কোথায়? হাত উল্টে ঘড়ি দেখল। এগারোটা। তারপর বারোটা। এক ঘণ্টা সময় আছে সোমার মুখোমুখি না হবার।

কিন্তু সোমার কী করবার আছে? শ্রীনিকেতনী একটা মোড়ায় বসে সুরেনকে বাজার বোঝাচ্ছিল মণিকা। এখনো নীচে নামেনি। রোববার। সুব্রতর অফিসের তাড়া নেই। তাছাড়া, দাদা এই তো মাত্র বেরিয়ে গেলেন। তাড়া নেই দিদির। ঠাকুর জানে একটা ভারি ওজনের টিফিন খাইয়ে দিয়ে সাতটা থেকে ন'টা তার ছুটি। দশটায় আবার 'জনতা' নিয়ে বসলেই হবে। সোমা কী আর করবে? তার তো সব দিনই, সারাদিন ছুটি। মণিকার কাছেই গিয়ে সে অগত্যা দাঁড়াল। রোববার যে মাংস হয় মাছের উপর তা-ই সে শুনছিল। প্রত্যেক রোববারই হয় আর সুরেনই তা কিনে আনে কিন্তু প্রত্যেক রোববারই তাকে মনে

করিয়ে দিতে হয় পনেরো শ' গ্রাম মাংসের কথা। অবশ্য গাঁড়য়াহাট বাজারে ভালো পাওয়া না গেলে যে কসবা যেতে হবে তাকে তা সুরেন বিলক্ষণ মনে রাখে। (তা তার লাভ্স্ লেবারও বলা যায়, বিশুদ্ধ প্রেমের মেহনত। মাংস-কেনার আভিজাত্যে কসবার একটি নবীনা ঝি তার প্রতি লুব্ধ হয়েছে।)

পুনঃ পুনঃ পনেরো শ'-টা বোঝাচ্ছিল মণিকা সুরেনকে—শুনতেও ক্লান্তি লাগছিল সোমার। হাই তুলল। তবু দাঁড়িয়ে রইল সে। নইলে আর কোথায় যাবে? একা একা ঘরে? বাড়িতে একটা রেডিও নেই। কেউ গান পছন্দ করেন না। সুপ্রিয়কে সে বলেছিল, —তাহলে একটা গ্রামোফোনই আনো। —আর তুমি সারাদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবে? তা-ই না? জানো ভালো জিনিস ব্যবহারে-ব্যবহারে শুকরের মাংস হয়ে যায়। জানবে না—ওতো আর রবীন্দ্রনাথ লিখে যাননি! স্ত্রীর কাছে সুপ্রিয় মুখোশ খুলে দাঁড়ায়, দেখায় সে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত মোটেও নয়।

স্ত্রীর কাছে কে না মুখোশ খোলে? অনেক বুদ্ধ অবতারই তো নৃসিংহ অবতার স্ত্রীর কাছে। কিন্তু তা-ও বোধহয় ভূমিকাতেই অবতরণ। সুপ্রিয় অন্তত জানে পাশব উপভোগে সোমাকে পেয়েই সে তাকে ঘৃণা করতে সুরু করেছে। সুপ্রিয় অন্তত জানে মেয়ের মুখের রবীন্দ্রসঙ্গীতের পালিশ ওদের ফেস-পাউডার ছাড়া কিছু নয়।

এখন সে ভাবছিল, মাছমাংসমসলাআনাজ নিয়ে ব্যস্ত যে-মহিলাটি তিনি কি পছন্দ করতে পারেন টেরিকটনের পোশাকে যে ভদ্রলোকটি বেরিয়ে গেলেন তাকে, বা সেই দিশী-ফিরিঙি এই ঘরের বউকে পছন্দ করতে পরেন? এণ্টনি ফিরিঙি আর ক'টা হয়? অথবা 'বাবা'র ঘরের দেয়ালে যে যন্ত্রণার মুখ দেখে এলো সোমা এইমাত্র, সে-মুখ কি তৃপ্তিতে হাসিখুশী এই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে পছন্দ করতেন, যেদিন তিনি আমাদের উপাচার্যের মতো বিচারপতি ছিলেন? হতেই পারে না, হয় না। তবু থাকতে হয় এক সঙ্গে, থাকে মানুষ। বনের পশুকেও পোষা করে ঘরে রাখে। একটা ময়ূর-পোষার কথা বলবে না কি সে সুপ্রিয়কে! কেকাধ্বনি ভালো লাগবে নিশ্চয়ই সুপ্রিয়র।

সোমা যখন নীচে নেমে যাচ্ছিল তখন বোধহয় রবীন্দ্রনাথকেই ভাবছিল : 'ময়ূর, করোনি মোরে ভয়!' ঠোঁটে হাসির ঢেউ উঠছিল তার। কিন্তু সে ভাবেও নি, বসবার ঘরে সুপ্রিয়কে পাবে, বাবাকে বা মহ্য়াকে নয়।

নববধূর মন্থর-চাপল্যে বসবার ঘরেই এলো সোমা।

সোমার সঙ্গে মুখোমুখি হবার ভয়টা ফ্যাকাশে করে তুলল সুপ্রিয়র মুখ। শুকনো তালু থেকে আশ্চর্যবোধক একটা শব্দ বেরোল,—সোমা! দন্ত্য 'স'-টা তালব্য হয়ে গেল।

—এলাম তোমাকে বলতে—ময়ূর পাওয়া যায় নিউমার্কেটে?

—সে কি কোনো ফুলের নাম? শান্তিনিকেতনী? ধাতস্থ হয়ে গেল সুপ্রিয়।

—না-না, অশোকের রান্নাঘরে যার মাংস রান্না হতো! হেসে উঠল সোমা—নিঃশব্দ, হয়তো বা বীভৎসই সে-হাসি।

কুড়ি

বীমাবাবুর বাড়ি যাবার মুখে যে মহারাজ অমৃতানন্দ এসে হঠাৎ হাজির হবেন তা জমিদারনন্দন পিনাকীরঞ্জন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। পরমুহূর্তেই অবশ্যি ভাবলে

পিনাকী, বীমাবাবু তো গৃহী হয়েও সচ্চিদানন্দ, তাঁর বাড়ির আনন্দোৎসবে যাবার মন তৈরী হওয়া মাত্র সন্ন্যেসী অমৃতানন্দের মন তা ক্রশ করল। মনোবিভূতি তো এঁদের সাংঘাতিক—ভূত-ভবিষ্যতে প্রসারিত। পিনাকী অবশ্যি জানে না, শুনেছে। মাধুরীর মুখে শুনেছে। মহারাজ অমৃতানন্দর প্রবেশ-পথ তো মাধুরীই খুলে দিয়েছিল। গোলপার্কে মাঝে-মাঝে ট্যাক্সিতে গিয়ে সে তো সিমলের সন্দেশই কিনে আনত না মহারাজদের কিছুকিছু আনন্দ-সন্দেশও সংগ্রহ করে নিয়ে আসত। আমার তো নাম পাল্টে শম্ভুরঞ্জন হলেই ভালো ছিল—তীর্থদর্শনে আমাকে তো সঙ্গী নেয় না মাধুরী, নেয় ভৃত্য শম্ভুকেই। ভৃত্যও জানে, এ হল কর্ত্রীর সংসার—আমি তো কবেই বাতিল, সন্ন্যেসি! রঙ্গভরা কথাগুলো ভাবে পিনাকী অমৃতানন্দকে দেখলেই।

বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হবে। দোহারা। লম্বাটে টানা মুখ। ছোটছোট চুল। হঠাৎ মনে হয় প্লেয়ার্স ছাঁট। কিন্তু গেরুয়া। খেলোয়াড়ও ভাববার অবকাশ নেই। অমায়িক কথা। মুখের ফর্সা রঙের মতোই যেন ফর্সা কথাগুলো। শিক্ষিত। অন্তত পিনাকীর চাইতে ঢের বেশি। এলে মাধুরী এই অমৃতানন্দকে দিয়ে গৃহশিক্ষকের কিছু-কিছু কাজ করিয়ে নিতে চায়। বলে,—দুলু-বুলুকে কিছু বলে যাবেন না? দুলু বুলুর পড়ার ঘরে গিয়ে বলেনও তিনি। কিন্তু কী বলেন, পিনাকী জানে না, খোঁজ নিতেও ইচ্ছে নেই। জমিদারের ঘৃণধরা রক্ত যে কোনোদিনই বিবেকানন্দ হবে না তা সে মৃত্যুর মতোই সত্য বলে জানে।

পিনাকী অমৃতানন্দর দর্শনেই হার্দ্য সম্ভাষণ জানালে,—আসুন, মহারাজ!

—ভালো? সব ভালো তো?—কাঁদন আসতে পারিনি—তিনসুকিয়া যেতে হয়েছিল। অমৃতানন্দ সাবলীল ভঙ্গিতে একটি চেয়ারে বসলেন।

ছোট খাট খাট থেকে উঠে দাঁড়াল পিনাকীরঞ্জন,—এখানে আপনার আরাম হবে।

—তা বটে! হেসে উঠে এলেন অমৃতানন্দ,—এ তো আর দুলুবুলুর পড়ার ঘর নয়! খাটেই আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন মহারাজ।

—ওদের দেখে কী বুঝছেন? কম্যুনিষ্ট হয়ে যাবে না তো! পিনাকী ভেবে নিয়েছিল, জওহরলালেরও কম্যুনিষ্ট হয়ে যেতে বেশি বাকি নেই। বিত্তবানের ছেলের বিবেকানন্দ হবার ভয় নেই কিন্তু কম্যুনিষ্ট হবার পথ প্রশস্ত।

—আজকাল অল্পবিস্তর কে তা নয় বলুন! শিক্ষাদীক্ষায় উজ্জ্বল দেখালেন অমৃতা-নন্দ,—সমাজসেবা কার না মনে? আমি নাম বলব না, আপনাদের পাড়ারই একজন বিত্তবান আমাকে একটি গ্রাম দান করতে চান, শর্ত: শহরের সমস্ত সুযোগ-সুবিধে ওখানে করে দিতে হবে—টাকা যা লাগে তিনি দেবেন। হওয়াটাই চান তিনি।

—খুব ভালো কথা! গাঁয়ের লোক ভীষণ ধূর্ত, মশায়—শেয়ালের সঙ্গে বসবাস করেই ওরকমটা হয়েছে। জানেন তো, আগে শেয়ালগুলোকে দহে ডুবিয়ে মেরে তবে কলকাতা হয়েছিল। মিছিমিছি তো শেয়ালদহ নাম নয়—বৈষয়িক আলাপে উত্তেজিত হয়ে উঠল পিনাকী, ইংরেজরা যে কলকাতা তৈরী করেছিল, সে ইতিহাসও হয়তো মৃদু ব্যথার মতো একটু খুঁচিয়ে দিল তাকে; কথা শেষ করল না সে, একটু থেমেই বললে আবার,—গাঁয়ে গিয়ে প্রথমত শেয়ালগুলোকে মারুন, মশায়। বৈষয়িক উত্তেজনাতেই হয়তো 'মহারাজ', 'মশায়'—সম্বোধনে চলে গেল।

আবার হাসলেন অমৃতানন্দ। ক্ষমাসুন্দর হাসি। বললেন,—সাহস হয় না, জানেন?

ওই শর্তে সাহস হয় না। সিমেণ্ট কোথা পাব? ধরুন, টিউবওয়েলে তো সিমেণ্ট দরকার। জলটাই আসল। যেম্নি মানুষের জীবন ওটা—তেম্নি চাষবাসেরও তো—গাঁয়ের স্বাস্থ্যের দিক থেকেও। কিন্তু কলকাতায় নিউ ইয়র্কের মতো মস্ত-মস্ত বাড়ির প্ল্যান—সব সিমেণ্টই তো ওখানে যাবে!

—আপনাদের গোলপার্কের বাড়িও তো কম সিমেণ্ট খায় নি পিনাকীও হাসলে।

—ওটা বিদশী-অতিথি-শালা। লাইব্রেরী। সমাজসেবারই তো বৃহত্তর দিক!

অমৃতানন্দকে কি বিবেকানন্দর মতো দেখাচ্ছে খানিকটা—তাকিয়ে ভাবতে লাগল পিনাকী! দত্তরা বেশ সুপুরুষ। যতো বাগানের দত্তরা। মাধুরী যে এখনো সুন্দরী তা-ও ভাবল পিনাকী। কিন্তু আজ হঠাৎই মনে এলো তার, মাধুরী তেম্নি এক দত্ত পরিবারের মেয়ে বলেই সন্ন্যেসী বিবেকানন্দর রক্তের টান ভুলতে পারেনি। বেলুড়মঠে সে যায়নি। কিন্তু গোলপার্কে যেতো সে সিমলার রসে নয়, সে-রক্তেরই টানে।

গম্ভীর হয়ে পিনাকী দরজায় চোখ নিয়ে বললে,—যান, ভেতরে যান, ওঁরা আছেন সব।

—তা-ই যাচ্ছি। কাজটা সেরে আসছি। চটপট উঠে অন্দরে চলে গেলেন অমৃতানন্দ।

কাজ আর কী? দেখাশোনা করা আর খবরবার্তা নেওয়া। জন-সংযোগ। সেবার কাছে আছেন যাঁরা, করতেই হয় তাঁদের—জনসংযোগ রক্ষা করতে হয়। বাছবিচার নেই। যেম্নি উদ্বাস্তুদের সঙ্গে তেম্নি—এই তো শোনা গেল কে এক বিত্তবান, মহারাজের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস—ধর্মবিশ্বাস নয়, কর্মবিশ্বাস। নিশ্চয় সে-বিত্তবান একটি গাঁয়ের মালিক! জমিদার কি গেছে? তাঁরা সব অন্য নামে রয়ে গেছেন। যেমন তার শ্বশুর-ঘর। কলকাতার উপর দশবারো খানা বাড়ি—মস্ত জমিদারি! আছেন জমিদার। এইতো এম্নি জমিদারের সঙ্গে সংযোগ মহারাজের যেম্নি উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সংযোগ। তেম্নি হয়তো এখনকার কুলীন এঞ্জিনীয়রদের সঙ্গেও—নইলে পাড়াগাঁকে শহর বানাবেন, কাদের সাহায্যে?

শহরে আর পিনাকীর ইচ্ছে নেই। তাই পাড়ার এঞ্জিনীয়রবাবুকে মনে এলেও—যাতায়াতে তাঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে, এমন ইচ্ছা পিনাকীর মনে এলো না। বাঁশদ্রোণী যাওয়া তো তার একরকম ঠিকই। কিস্তিটা পেলেই হয়। মাধুরীর আপত্তি হবে না। স্কুল-টুল থাকলেই তার হল। সে-ও তো আজকাল জন-সংযোগের এক পাণ্ডা হয়ে উঠেছে। বীমাবাবুর স্ত্রী, পুত্রবধূ, দৌহিত্রীর জিজ্ঞাসাবাদেই নেশাগ্রস্ত আজ। তাছাড়া মহারাজের সন্ধান তো তার উদ্বাস্তুদের হাতে কিছু টাকা ঢালবার জন্যেই। মাধুরীর তহবিল থেকে কতো গেছে এ-পর্যন্ত তার খোঁজ নেয়নি পিনাকী, নিতে চায়নি। স্ত্রীধনে তার কেন উৎসাহ থাকবে? তার পাঁটা সে ল্যাজেই কাটুক আর মাথায়ই কাটুক—পিনাকী আপত্তি জারি করতে যাবে কেন? তাই শেষ কিস্তির টাকাটা হাতে এলে সে যখন বাঁশ-দ্রোণীতে বীমাবাবুর জমির অংশীদার হতে যাবে, তখন মাধুরীরও আপত্তি হতে পারে না। এ-বাড়ি থাকে তো থাকুক না, মাধুরী এখানে থাকবে, থাক! সে আর এখানে নেই। ১৯৬৫-তে যদি গড়িয়াহাটা ব্রীজ শেষই হয় তাহলে এ-ও দ্বিতীয় চৌরঙ্গী না হয়ে যাবে না। আসা যাবে তখন বড়োদিনে। দেখা যাবে দিশী মেম-সায়েবদের ফূর্তি! এখনকার গানে, খানায়, পোষাকে তো আধাসায়েব বনেই গেছে বাঙালী না হয় দু'বছর পর পুরো সায়েবই দেখা যাবে! যোধপুর ক্লাব আবার।

আর যদি বাড়িতে সে আজ নিমন্ত্রণে যাচ্ছে—সেই বীমাবাবু—তাঁর পুত্রটিও বা কী?

কেউ বলবে অভিজিৎ রায় বাঙালী? রয় অ্যাভন-ট্যাভন একটা নাম নিয়ে নিলেই পারে!

অ্যাভন আর শেক্‌স্পীয়ার নিয়ে যা মাতলামি চলছে, তাই হয়তো অ্যাভন-নামটা মনে এলো পিনাকীর। সঙ্গে সঙ্গে মনে এলো যৌবনে শেক্‌স্পীয়র পড়ার দিনগুলো। মল্লিকের তখনই রাত্রিতে ঘুম হত না—এখন তো আসবেই না হয়তো আধেক রাত রুফস্ টুইস্ট করে এলে কারো ঘুম হয়—সায়েবদের হতে পারে। তখন বলত মল্লিক,—জানিস, পিঙ্কু, কোন্ পাপে লেডি ম্যাক্‌বেথ মা পেয়েছি? বাবা ঘুমোবেন না ভেবেছিলেন তাই মার মতো সঙ্গিনী জুটিয়েছিলেন। এ-রক্তে ঘুম নেই। কড়ব শ্যাল স্লিপ নো মোর। জানি তাই ব্রোমাইড ধরেছি! ব্রোমাইড থেকে মদে খুব সহজেই প্রমোশন পেল মল্লিক—হয়তো বিলেত যাবার আগেই। হচ্ছে তো! শেক্‌স্পীয়রের চরিত্র বাঙালীদের মধ্যেই হচ্ছে! তার পৈতৃক পাড়ায়ই হয়েছে! পেনেটিতে যাও—এক পড়ন্ত জমিদার বাড়িতে এখন না-হয় রবীন্দ্রোৎসব হয়। দেয়ালে তাকাও—সব অয়েল-পেণ্টিং—সায়েবদের পেছনে কতো তেল-খরচ। রাঁধা নাচাবার জন্যে নয়। লাট-বেলাটের মেজাজ খোশ রাখবার জন্যে। সায়েব চিত্তকরের আঁকা ওথেলোর দৃশ্যাবলী! "ওথেলো" বইটা তো মেমদের সাবধান করবার জন্যে! খবর্দার, নেটিভদের সঙ্গে যেও না—গেলে ডেসডিমোনা হবে!

এসব ভাবতে গিয়ে খুবই আরাম পেল পিনাকী। তার যদি সিগারেটের অভ্যাসও থাকত, তাহলে এই আরামে একটা সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে দিব্যি পাঁচ-দশ মিনিট তার বাগানের ফলফুল গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারতো!

বাগানের দিকে সে তাকালো ঠিক কিন্তু নাকে সিগারেটের আমেজি গন্ধ নিয়ে নয়। সেদিনকার সেই গান্ধীপোকাটার গন্ধই যেন কী এক স্নায়বিক রহস্যে নাকে এলো তার! হয়তো গান্ধীজিকে মনে পড়ল আর গান্ধীজিকে যে সে কোনোদিনই পছন্দ করতে পারেনি তা-ও হয়তো মনে এলো! তিনিই তো সুভাষ বোসকে তাড়ালেন! শৌলমারির সাধু কি সুভাষ বোস? জিজ্ঞেস করলে হয় মহারাজকে!

অন্দর থেকে সদরে এলেন আবার অমৃতানন্দ। পেছনে সশ্রদ্ধ মাধুরী।

শৌলমারির কথা ভুলে পিনাকীরঞ্জন হয়তো এখন মাধুরীর পরিবর্তিত মুখটাই এক নজর দেখে নিলে। এমন দেখা যায় আজকাল মাঝে-মাঝে মাধুরীকে। মার মুখে কি দেখেছে পিনাকী এ-ধরনের কোনো ভাব? দেখেছে। পুজোর ক'টা দিন। দুর্গা-ঠাকুর যদ্দিন মণ্ডপে থাকতেন, মাত্র সে-ক'টা দিন। বাবাকে ভয় করতেন মা কিন্তু ভক্তি হয়তো করতেন না। ভক্তি। ভক্তিই বোধহয় বলা যায় একে, যা সে এখন মাধুরীর মুখে দেখল আর দেখেছে মাঝে-মাঝে যখন সে বাবার ফটোটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তখন। আমার সামনে কখনো এ-মুখে দাঁড়ায়নি মাধুরী—দাঁড়াবেও না—কথাটা নিজেকে শুনিয়ে একটু হাসলে পিনাকী। তারপর মহারাজকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালে,—এ-পাড়ায় সবার সঙ্গে দেখাশোনা শেষ তো?

—এ-পাড়ায় আর কোথায় যাই—ওই আপনাকে যাঁর কথা বললাম, তিনটে চা বাগান আছে তাঁর আসামে—তিনিও দয়া করে মাঝে-মাঝে স্মরণ করেন তা-ই যাওয়া। দরজায় দাঁড়িয়েই বললেন অমৃতানন্দ, ঘরে এলেন না।

আজ যে শম্ভুকে নিয়ে বেরিয়েছিল মাধুরী তা শুধু রূপোর বাটি পালিশ করাবার জন্যে নয়, মহারাজেরও খোঁজ নিতে! হাল্কাভাবে কথাটা ভেবে হাল্কা কথাই বললে পিনাকী,—তা আপনিও তো তিনসুকিয়া ঘুরে এলেন—চা-বাগানবাবুকে নিশ্চয়ই বাগানের

খবর দিতে পারবেন!

—অবশ্যি তিনি বলেছিলেন যাবার তারিখটা জানিয়ে যেতে, তাঁর বাগানের ম্যানেজারদের লিখে দিতেন যেখানেই যাই সুব্যবস্থা করতে। কিন্তু হঠাৎ যেতে হল—তারিখটা জানানো হয়নি। হাসতে লাগলেন অমৃতানন্দ।

এটুকু বুঝবার ক্ষমতা ছিল পিনাকীরঞ্জনের, যাঁরা সেবার কাজে আছেন, তাঁদের আর সেবার দরকার হয় না। বললে সে,—চা-বাগানবাবু হয়তো আপনাকে পারিক রিলেশন অফিসার করতে চান। সেই অজ্ঞাত বিত্তবানের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করে পিনাকী হেসে উঠল!

—সে যোগ্যতা আমার কোথায়! আমি তো জ্ঞানীগুণীকৃতীসমাজে তাঁদের কথাবার্তা শুনতে আসি—কারো সঙ্গে সংবসনে যাবার যোগ্যতা কই?

'সংবসন' কথাটার মানে আন্দাজ করে পিনাকী বললে,—আপনার গেরুয়ায় ঢের শান্তি, মহারাজ—যাবেন না শাদা-পোশাক-পরা শান্তির হরবোলাদের সঙ্গে কথা বলতে!

—কিন্তু শীলম্ সংবসনাং জ্ঞেয়ম্—ঘনিষ্ঠতায় না এলে কার স্বভাব জানব বলুন। কথাটার প্রায় অর্ধেক মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বললেন অমৃতানন্দ। তারপরই যাবার তাড়ায় বলে উঠলেন,—আচ্ছা—চলি আজ।

এতক্ষণে কথা বললে মাধুরী এবং দুঃখিত মুখে,—জানো, স্বামীজি একটুকিছু মুখে নিলেন না!

—আপনার সিমলের সন্দেশ তো—আরেকদিন হবে! স্বামী-স্ত্রী দুজনের কাছেই ঘাড় কাৎ করে সম্মতি নিয়ে অমৃতানন্দর ঋজু দেহ দৃশ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

শ্রদ্ধা, ভক্তি, দুঃখ প্রভৃতি সুলভ ভাবগুলো মাধুরীর মুখ থেকে তিরোহিত হয়ে তা স্বভাবে ফিরে এলে পিনাকী বললে,—তৈরী হয়ে নাও—ক'টা বাজে?

—আমরাও নিমন্ত্রণে যাই আর দুলু-বুলুও ফাংশানে, সভায় যাওয়া সুরু করুক। সুরু তো করেইছে—পড়াশুনো কিচ্ছু হবে না! মাধুরী ছেলেদের শিক্ষা-দীক্ষা না-হওয়ার আশঙ্কায় নিজেদের দায়ী করে বিষণ্ণ হল।

—মহারাজ বললেন—পড়াশুনো হবে না?

—তিনি বলবেন কেন? তিনি তো আমার কথা শুনে হেসেই উঠলেন! ওঁদের ওখানে ছেলেরা ভালো ফল করে—হাসবেন না!

দুলু-বুলুর জন্যে মোটেও চিন্তিত না হয়ে চিন্তিত দেখিয়ে বললে পিনাকী,—হুঁ।

—আমি তো বললাম স্বামীজিকে—দুটি গরীব ছেলের পড়াশুনোর সমস্ত খরচ দেব, তাদের আশীর্বাদে যদি দুলু-বুলুর কিছু হয়! তোমার যা-কিছু হয়েছে, কেন? শোভা-বাজার-বাগবাজারের কোন্ গরীব ছেলে শ্বশুরমশাই-এর হাত থেকে স্কুলের মাইনে না পেয়েছে!

দত্ত-বাড়ির মেয়ের হাত খোলা, হাটখোলার মানুষরাও পিছিয়ে ছিলেন না কিন্তু সে-সব ভাবনায় নিবিষ্ট হল না পিনাকী, কোনো ভাবনায়ই নিবিষ্ট হতে চায় না সে, বিশ্ব-সংসারটা যে চলছে কোন্ ভাবনায়, শুনি? এমন একটা প্রশ্ন করেই সে ভাবনার মাছিগুলোকে তাড়িয়ে দেয়। এখনও নিশ্চিন্ত মনে স্ত্রীর সঙ্গে পরিহাসে সময়ক্ষেপ করতে চাইল সে, যে সময়টুকু হাতে আছে বৌমাবাবুর বাড়ি যাবার আগে,—বাবা দাতা না হলে কি দত্তবাড়ির মেয়ে ঘরে আনেন?

—কিন্তু তুমি কী-টা হলে শুনি? মাধুরী ঠোঁট কামড়ে হাসলে একটু।

—কিছুই না। কিছু যে হতেই হবে তার কী মানে আছে?

—বেশ, না হলে। কিন্তু দুলুবুলুকে তো তোমার মতো বসিয়ে রাখব না!

—বসিয়ে রাখবে কেন? লক্ষ্মীছাড়া করে দাও!

—হাঁ, তোমার এই ছোট-খাটের সিংহাসনে তুমি নারায়ণ শিলাই হয়েছ।

—তবু তোমার কাছে নারায়ণ শিলা—কেউ তোর তার আজ কষ্টিপাথরেরও দাম দেয় না।

—কী করে দেবে? স্যাকরারাও তো না কি উজাড়!

—সবাই উজাড় হবে, দাঁড়িয়ে থাকবে কতোগুলো লোহালক্কড়!

লোহালক্কড় চুম্বক-শক্তির পাল্লায় পড়ে কিন্তু লোহালক্কড়ের যে চৌম্বক শক্তি আছে, তা জানা ছিল না পিনাকীর। হঠাৎ মাধুরীকে ঘোমটা টেনে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখে এবং তার স্থলাভিষিক্ত এঞ্জিনীয়রবাবুকে দেখে অবাক হয়ে লোহালক্কড়ের আকর্ষণের কথাটাই ভাবলে পিনাকী। কোনো দিন জজবাবুর এই 'যন্ত্ররাজ' এ-বাড়ির মাটিতে পদার্পণ করেছে বলে মনে পড়ল না তার। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? আজকের সারাটা দিনের হাল্কা মেজাজের বশেই পিনাকী এঞ্জিনীয়রবাবুকে অভ্যর্থনা জানালেন,—কী সৌভাগ্য—এঞ্জিনীয়রবাবু, আসুন—বসুন, না এখানে কেন? চেয়ারটাতেই বসুন।

—চৌকিতেও আপত্তি ছিল না—হাসি-হাসি মুখে বললেন অসিতরঞ্জন,—তবে কি না সারা জীবন তো টেবিলেই কাজ করেছি—চেয়ারে লোভ রয়ে গেছে! হাতের মুঠোর মোড়কটা তখনও দেখালেন না তিনি।

—তবু খাট-চৌকির লোভ কার না থাকে—মুখের মিহিন পর্দায় হাসির হাওয়া লাগল পিনাকীর,—সারাদিন টেবিল-চেয়ার করলেও তো রাত্রিতে খাট-পালঙ্গ চাই!

যে মহিলাকে সরে যেতে দেখলেন অসিতরঞ্জন তিনি যে বিগত-যৌবনা নন, সে-কথাই হয়তো ভাবলেন তিনি, যদিও সকাল থেকে শুরু করে ঠিক আগেকার মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি শুচিতায় সমস্ত সময়টাই যাপন করছিলেন। বিয়ের আলাপে কুমারীরা যেমনি রাঙা হয়ে ওঠে, যৌন ইঙ্গিতে বিবাহিতরা তেমনি খানিকটা চাঙা হতে বাধ্য। একটু সোজা হয়ে বসে অসিতরঞ্জন বললেন,—আমাদের মশায়, রিটায়ারমেন্ট ফ্রম এভ্‌রিথিং। হাতের মুঠো খুললেন অসিতরঞ্জন,—গিয়েছিলুম দক্ষিণেশ্বর! কিছু প্রসাদ। স্ত্রী বললেন, তীর্থের প্রসাদ প্রতিবেশিদের মধ্যে বণ্টন করতে হয়। নিয়ে এলুম আপনার জন্যে।

হাত বাড়িয়ে মোড়কটা হাতে নিয়ে বললে পিনাকী, কী অদ্ভুত যোগাযোগ এঞ্জিনীয়র-বাবু—এইমাত্র বেলুড়ের এক মহারাজ পদার্পণ করে গেলেন আর তিনিও গেছেন আপনি এলেন দক্ষিণেশ্বরের প্রসাদ নিয়ে! আমার বোধহয় দিন ফিরল!

এবার এঞ্জিনীয়রবাবু সচ্চিদানন্দবাবুর কথার মোড়ক এখানে আসার আসল অভিপ্রায়টা উপস্থিত করলেন,—দিন তো ফিরেইছে—সচ্চিদানন্দবাবুর মুখে যা শুনলাম! বাঁশদ্রোণীতে না কি জায়গা নিচ্ছেন। বেশ জায়গা—যেমনি নিরিবিলি তেমনি সুন্দর। কী রকম কন্‌স্ট্রাকশান হবে, ভাবলেন কিছু? হাসিতে বেশ তীক্ষ্ম দেখালেন এঞ্জিনীয়র।

মাধুরীর সঙ্গে আলাপে যে লোহালক্কড়ের কথা পেড়েছিল পিনাকী তা-ই এখন মনে পড়ল। কিন্তু তা কী বাঁশদ্রোণীতে বাড়ি করার মন থেকে? না। কিন্তু মনের গভীরে কী সব থাকে মানুষের, কে বলবে? হাসল পিনাকী, বললে,—তেমন কিছু ম্যাচুর করলে

বীমাবাবু আর আপনিই তো খবর পাবেন সর্বাগ্রে!

দক্ষিণেশ্বর ভ্রমণে মিত্রার খানিকটা সুস্থতাই নয়, আরেকদিকেও তেমনি যে খানিকটা ফল হাতেহাতেই পাওয়া যাবে, তা দেখে এঞ্জিনীয়রবাবু কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজিয়ে নিলেন।

একুশ

বাড়ি ফিরতেই হবে। ভাবছিল অভিজিৎ। এদিকে মেয়রের ডাকে ময়দানে যে জন-সমাগম আজ তার উপর সেকেন্ড লীডার লিখবার তলবে অফিসঘরে অভিজিৎকে এখনো বসে থাকতে হচ্ছে। এখন ক'টা? হাতঘড়ি দেখল অভিজিৎ। সাড়ে ছয়। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের একটা কথার উপরই চোখ নিল সে এই তৃতীয়বার: 'জওহরলালজি ওয়াজ এ ম্যান অব প্রোফাউন্ড সিম্‌প্যাথি—' কার উপর সহানুভূতিশীল ছিলেন পণ্ডিতজী? ময়দান-সভার প্রিণ্টটার দিকে তাকাল অভিজিৎ। স্টাফ-ফটোগ্রাফারের তোলা ছবি। প্রথম সারির কয়েকটি মেয়ে অধোবদন। আর কেউ না। বিশেষ একটি বিবাহিতা মহিলা। মহিলারা না কি পণ্ডিতজীকে বীর ভাবতেন! হেলেনিক সংস্কৃতি এখনো বেঁচে থাকলে কী কাণ্ডই না হ'ত! হেলেনিক! শুক্লাকে মনে পড়ল অভিজিতের। ও কি বলেছিল ওদের পূর্ব-পুরুষের কালচার হেলেনিক ছিল? যাক্ গে, শুক্লা বিবাহিতা নয়। গৌরী, মল্লিকা এরা সব বিবাহিতা। সভায় এলে হয়তো ওই মহিলার মতোই অধোবদন হত। মোটের উপর অভিজিৎ এমন এক পুরুষ নয় যাকে ওরা বীর ভাবতে পারে।

কলমটা রেখে অভিজিৎ একটা সিগারেট ঠুকে ঠোঁটে নিলে। প্রথমত, সিগারেট মহিলাদের পরম শত্রু। দ্বিতীয়ত, রাত জেগে পড়াশুনো। সুরাটা কি তেমন? না-না—ওটা তো বীরভোগ্যা! হেসে অগ্নিসংযোগ করলে অভিজিৎ তার সিগারেট!

কী করতে যে মানুষ মানুষের কাছে আসে! সিম্‌প্যাথি? দুঃখে বিষন্ন হতে আর সুখে হাসি-হাসি? অসম্ভব। দরকার ছাড়া মানুষ কারো কাছে যায় না। পণ্ডিতজী মাঝে-মাঝে পর্বতের ডাকে সব ছেড়ে-ছুঁড়ে পালাতেন। কেন? তাঁর বিপন্ন মন দেখতে পেতো সন্ধ্যার হিমালয়ে গোলাপী রঙ আর আত্মার চোখে দেখতে পেতেন তুষারের শুভ্র প্রশান্তি!

বিপন্নতা আর প্রশান্তি। আছে অভিজিতের? বাবা-মা, গৌরী-অমিতব্রত-পারমিতা আর যে বাচ্চাটা এলো—সবাই মিলে তারা একগুচ্ছ গোলাপ! তাছাড়া আর কী? শুধু সাদা জিনে প্রশান্তি। 'লাইফে'র মার্কিনী জীবনটাকেও মনে হয় নিস্তরঙ্গ!

নিজের রচনার দিকে চতুর্থবার চোখ নিলে অভিজিৎ। ধোঁয়াটে চোখ। সিম্‌প্যাথি! সিম্‌প্যাথি নিয়ে কী লিখেছে সে? নিশ্চয়ই সহানুভূতিশীল ছিলেন জওহরলাল। মস্ত সহানুভূতিশীল। কতো অনুভূতির মানুষকেই না তিনি টেনেছেন। সহানুভূতির চৌম্বক শক্তি বিরাট। ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে যাঁরাই আছেন, জওহরলালের শোক-সভায় মিলিত হয়ে অধোবদন হবেন! অনুভূতিশীলতা সাহিত্যিকেরই ধর্ম। রাষ্ট্রপতি যেখানে দার্শনিক —প্রধানমন্ত্রীর তো কবি হওয়াই উচিত সেখানে! ঋতুরাজ! তার জন্যে কিসের শোক? যযাতির মতো বার্ধক্যহীন সে—মৃত্যুহীন!

হাসল অভিজিৎ। এসব কথা কি সে বিশ্বাস করে? কোনোদিনই না। রবীন্দ্রনাথের

মৃত্যুর পর বাংলাসাহিত্য আর ছোঁওয়া যায়? একটু আন্তরিকতা আছে কারো রচনায়? সব জার্নালিজম্‌—ইয়্যালো, হোয়াইট না-হয় রেড্‌। যোধপুর পার্কের ওই পদ্মবিভূষণ না কি আমার মতোই হোয়াইট জার্নালিজম্‌ চালিয়েছে! কে বল্‌লে? কে? সান্ন্যাল? সান্ন্যালই হয়তো!

বাবা বুড়োদের সমাবেশ করলেন, নইলে সান্ন্যালদম্পতীকে পানীয়ের নিমন্ত্রণ করা যেতো আজ বেবিটার হেল্‌থ ড্রিঙ্ক করা যেতো!

স্ক্রিব্‌লিং প্যাড থেকে লেখা পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে দাঁড়াল অভিজিৎ। ঘড়ি দেখল। পৌনে সাত হয়নি। ট্যাক্সি নিয়ে সাতটায় পৌঁছুনো যাবে গোলাপ-বাগানে। সিগারেটটা ছাইদানির জলে ডুবিয়ে—এডিটরের কামরায় যাবে বলে আপন কামরা ত্যাগ করল সে। লেখাটায়—এ স্ক্রিব্‌লিং-এ এডিটরের প্রয়োজন মিটবে তো? সম্পাদকের সামনে যখন সহকারী বিশেষণটা আছে তখন তাকে কতোদিন থেকেই তো প্রয়োজনের তেতো পিলে সহানুভূতির সুগার-কোটিং আশঙ্কা করে সম্পাদকের কামরায় যেতে হয়েছে!

কিন্তু কামরায় ঢুকেই অবাক অভিজিৎ! সম্পাদকের সামনে পাশাপাশি চেয়ারে সান্যাল আর শুক্লা! অদ্ভুত, অদ্ভুত! পরিচিতরা হঠাৎ মনে এলে তাদের সঙ্গে দেখা না হয়ে আর উপায় থাকে না। টেলিপ্যাথি?

মিহি হাসিতে আর ভুরুর টানে দুজনকেই সম্ভাষণ জানালে অভিজিৎ।

ওটা ঠিক কথা বলবার সময় নয়। প্রতীক্ষার কয়েকটি মুহূর্ত। যার জন্যে প্রতীক্ষা সে ছাড়া চারপাশে, বাইরের এবং মনের চারপাশে যখন আর কেউ নেই। পরীক্ষক তোমার পরীক্ষার খাতা তোমার সামনে দেখে চলেছেন তাঁর লাল পেন্সিলের ডগা উঁচিয়ে—পেন্সিলের টানের উপর তোমার পাশ-ফেল ঝুলছে। কোথায় তাকাবে তুমি আর? ভুলে যাবে ভুরুর টান। ছিলার টান ভুলে অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদের চোখ তোমার।

এ-পরিহাসের কথাও মনে এলোনা অভিজিতের তখন যে আজ সে মাতামহ কিন্তু যৌবনের পরীক্ষার দায় তার আজও ঘুচল না।

যখন সম্পাদক, ও. কে. বললেন, শুধু তখনই নিষ্কৃতি তখন চারপাশ যেন কথা কয়ে উঠল, মনও বলতে পারল, আর কতোদিন, এই লেখা-লেখা খেলা আর কতোদিন খেলতে হবে? কবে বলতে পারব, যা লিখেছি শুধু তা পরীক্ষা পাশের জন্যে?

শুক্লা বললে,—আপনার কামরায় আমরা যাব ভাবছিলাম, রায়!

—ও—স্বপ্নোত্থিতের চমক আনলে অভিজিৎ চোখে-মুখে।

এডিটর হয়তো ফার্স্ট লীডারে ডুব দিয়েছিলেন। সান্যাল বললে,—চলুন, চলুন অভিজিতবাবু। এডিটরের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। এখন আপনার দু-পাঁচ মিনিটের ধৈর্য প্রার্থনা করছি। তারপর ধরুন, আধঘণ্টাটাক্‌ কলমের শ্রম!

শুক্লা আর সান্যাল প্রায় একসঙ্গেই হাসল এবং দাঁড়ালও প্রায় একসঙ্গে। হোক না তার সেলারের ইয়ার সান্যাল তবু সম্পাদকের ঘরের গাম্ভীর্য অটুট রেখে অভিজিৎ নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো।

যা শোনাবার জন্যে ধৈর্য প্রার্থনা করছিল সান্যাল তা শুনে অভিজিতের মনে হল, এ এক সেনসাশানাল নিউজ। একসময় সান্যালর সাংবাদিকতায় যথেষ্ট দক্ষতা ছিল, খবরটা জানাতে যেন সে-প্রতিভাই তার ফিরে এলো। এবং তার যে গুণ ছিল নৈর্ব্যক্তিকতা, তা-ই। কিন্তু শুক্লা ইমোশনাল হয়ে উঠছিল প্রায়ই। এবং তা না হয়ে যখন তার উপায় ছিল না,

কারণ সে মেয়ে এবং মূল ঘটনাটা তাকে নিয়েই তখন পাঁচ মিনিট কেন পনেরো মিনিট সময় কী ভাবে যে চলে গেল অভিজিৎ বলতে পারবে না। ধৈর্যের পরীক্ষা তাকে মোটেও দিতে হয়নি, শুক্লার অস্বাভাবিক স্বীকারোক্তি শুনতে।

খবরটা সুমিত্র উপাধ্যায়কে নিয়ে—যিনি পদ্মবিভূষণ এবং যোধপুর পার্কে থাকেন। শুনেছে অভিজিৎ। একেলে হতে গিয়েছিল উপাধ্যায় শুক্লার সঙ্গে মেলামেশা করে। কিন্তু সেকেলে বুড়ো শালিখের ঘাড় যাবে কোথায়? সান্যালকে খাটিয়ে নিয়ে টাকা দেয়নি—এই সব নোংরামি ঘাঁটতে অনুরোধ করছে সান্যাল। এডিটরকে না কি রাজি করিয়েছে শুক্লা। আমাকে বলা কেন? অভিজিৎ মন থেকে সায় পাচ্ছিল না। সান্যালের ভালো পেন্‌—একটা প্যারা লিখে দিলেই পারে!

তাছাড়া, হাতঘড়ি দেখলে অভিজিৎ। সাড়ে সাতটা। তাড়া খেলে আবার সে গোলাপ বাগানের। ভুরুতে ঢেউ উঠল আর ঠোঁটে সিগারেট।

গোলাপী হাসিতে শুক্লা বললে,—এখন তো আপনার দশ মিনিটের ব্যাপার, শ্রীযুত রায়। তারপর দয়া করে যদি আমার ওখানে একটু পান করে যান!

বেশ কৌতূহলী হয়ে তাকাল এবার অভিজিৎ শুক্লার মুখে—সান্যালের স্ত্রীও পানাসক্ত—সুশ্রী কিন্তু কেমন যেন একটু কাঠিন্য আছে সে সুশ্রীতায়—কিন্তু শুক্লা? হয়তো ক্লিওপাত্রার মতো দেখায় কখনো-সখনো, এখন তো দিব্যি মোনালিসার টোলখাওয়া পৃথুল গালে বাঙালিনীর রহস্যময়তা উঁকি দিচ্ছে। মনে মল্লিকার জায়গায় যেদিন প্রথম গৌরী এসে দাঁড়িয়েছিল সে-রাত্রির ছায়াটা ভেসে গেল অভিজিতের মনের উপর দিয়ে। তারপর অমৃতব্রতর জন্ম, পারমিতার জন্ম। অমি আর পুপু কতো বড়ো হয়ে গেল! মুন্নানিকের মেয়েরা কী রকম? অলকের সঙ্গে পুপুর বিয়ে হলে মন্দ হত না! হয়তো এতো শীগগীর মা হত না পুপু। পুপুর বেবিটার 'নিরো' নাম রাখলে কেমন হয়? দিক্‌-না আবার পুড়িয়ে রোম—দিব্যি লায়ার বাজাবে সমুদ্রগুপ্তের মতো খাটিয়াতে বসে! গোলাপ বাগানের কথা মনে পড়ল অভিজিতের। ঘড়ি দেখল আবার!

শুক্লা অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললে,—রয়, প্লিজ! দশটা মিনিট ডিভোট করুন।

অনুনয়ে বিশ্বাস নেই অভিজিতের, মল্লিকাও অনুনয় করেছিল—অভিদা, আমাকে তুমি চেয়ো না—অনেক ভালো মেয়ে পাবে, সুখী হতে পারবে! ও কিছুনা, মেয়েরা অনুনয় করেই। কিন্তু শুক্লার চোখে, অনুনয়ের জ্যোৎস্নার ভেতরেও যেন একটা জ্বালা দেখতে পেল। মর‍্যালিটিকে যতোই ভাসানে পাঠাক অভিজিৎ, সে-শুভ্র প্রতিমার মরাল যেন ভেসে এলো তার মনে। সান্যালকে বললে সে,—আপনি লিখুন না সান্যাল—আমি দেখে দিচ্ছি যদি আমার কোনো সাজেশন থাকে বলব।

—আমার কলমে মরচে ধরে গেছে—আপনিই লিখুন। সান্যাল ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে বললে।

একটি মেয়ে তাঁর শালীনতায় আঘাত পেয়েছে। ভাবল অভিজিৎ। স্ক্রিবলিং প্যাডটা টেনে নিয়ে আর দ্বিরুক্তি করলে না।

কাগজের উপর খস-খস শব্দটা যখন পূর্ণ যতি নিলে, শুক্লার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সান্যালের মুখেও ধোঁওয়ার কুয়াশা আর নেই। বিত্তবানের বা অ্যাল্‌কোহলিকের পালিশ তার মুখে, যে-পালিশে বয়স ধরা পড়ে না।

অভিজিৎ লেখাটাতে চোখ বুলোল। ইয়ালো জার্নালিজম হয়ে গেল না তো?

প্যাডটা সে সান্যালের সামনে এগিয়ে দিলে।

—দেখুন, যদি সংশোধন করতে হয়। উপাধ্যায় এক্সপোজড্ হওয়া চাই—কিন্তু লেখাটা অব্‌জেক্‌টিভ হওয়াই ভালো।

দ্রুত পাঠে কাজ সেরে সান্যাল পাতাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে এডিটরের কামরার উদ্দেশে যাত্রা করলে।

একা, শুক্লার মুখে তাকালো এবার অভিজিৎ। দুর্লভ হলেও অনভ্যস্ত মুহূর্ত্ত নয়। কাজেই প্রায় অমিতব্রতর বয়সে চলে যেতে পারল সে।

—আপনার চুলের ব্ল্যাক্‌প্রিন্সটা সত্যি আজ সিগ্‌নিফিকেণ্ট! বললে অভিজিৎ ঠোঁট এলানো হাসিতে।

—ও, তা-ই? থ্যাঙ্কস্ মিঃ রয়!

কথাটাকে বিদেশী মহিলার মতো নিতে পারল শুক্লা। খুশী হল অভিজিৎ। বাবার সেই রূপসী নার্সকে মনে পড়ল তার যার সঙ্গে কথাবার্তায় সে খুশী হত।

—আচ্ছা বলুন তো—অভিজিৎ চোখে কৌতূহল তুলে ধরল,—জওহরলালকে কী ভাবে আপনারা গ্রহণ করেছেন। মানে, মহিলারা।

—পণ্ডিতজী? আওয়ার স্যাডেন্‌ড্ লাভ!

—বিষণ্ণ গোলাপ?

—নিঠুর দরদী!

দ্যাট্‌স্ দ্য ওয়ার্ড। নিঠুর। আমার লীডারের প্রুফটা দেখে যেতে হচ্ছে। কথাটা কোন্ শব্দে ভালো শোনাবে বলুন তো—ক্লুয়্যাল না হার্ডেণ্ড?

—পণ্ডিতজী সম্পর্কে? এপ্রিল ইজ দ্য ক্লুয়্যালেস্ট মান্থ ব্রিডিং লাইলাক আউট অব ডেড ল্যান্ড!

—রাইট্। মাও-সে-তুঙের ফুল ফোটানো নয়!

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল। হতে পারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণে—কিন্তু সুর মেলাল সুর, তারের সঙ্গে মোটা তার। এবং সে অর্কেস্ট্রায় সান্যাল প্রবেশ করে বলল, —রয়ের রচনা কি এডিটর ডিস্-অ্যাপ্রুভ করতে পারেন?

বাইশ

রাত দশটা অবধি সমস্ত তল্লাটে চোঙ মুখে লোক বার করতে হয়েছে এই ঘোষণা দিয়ে : বন্ধুগণ, আমাদের প্রিয় নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর তিরোধানে দক্ষিণ-পূর্ব ঢাকুরিয়ার শোকসন্তপ্ত অধিবাসীদের একটি বিরাট সমাবেশ আগামী কাল বিকেল পাঁচটায় যোধপুর পার্কে পোস্টাফিসের বিপরীত দিকে সার্বজনীন পূজামণ্ডপে আহ্বান করা হচ্ছে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন সর্বজনপ্রিয় সাহিত্যিক রণেন মিত্র এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন প্রাজ্ঞন বিচারপতি শশাঙ্কশেখর বসু। আপনারা এই শোক-সমাবেশে দলে দলে যোগদান করুন। তদুপরি বিকাশের নিজের এলাকা—সেখানে নিজেই সে চোঙ মুখে নিয়েছে। তার খাতিরে পাড়ার একশো ছেলেমেয়ে তো অন্তত ভীড় করবে সভায়! সত্যপ্রসাদ যাদবপুরের দিকটা দেখছে। তাছাড়া বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী আর চীন-পন্থীরা তো ঘরেরই মানুষ—হাল আমলে সিনো-সোভিয়েট বর্ডার আর অ্যাফ্রো-এশিয়ান কন্‌ফারেন্স

নিয়েই না যা-একটু দলাদলি! আর পণ্ডিতজী বিশ্বপ্রিয়, তাঁর শোকসভায় এসব ইস্যু উঠতেই পারে না। সারাদিন টই টই করে, কোথায় কাপিবাগান, কোথায় বাপুজী কলোনী, নস্করপাড়া, আর শহীদনগর—শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড আর সেলিমপুর রোড—রাস্তায়, রকে, লাইব্রেরী ঘরে, চায়ের দোকানে, পাইপ-কারখানার পাইপের উপর বসে আপোষ-মীমাংসার কতো জটলার পর বিকাশ একটু ক্লান্তই হয়েছে কাল। সবার উপর, জজবাবুকে প্রধান অতিথিতে রাজি করানো। অলকের জন্যেই হল! বরং অলকের আগ্রহে। সুমিত্রদা চটে গেছেন শুনে অলকেরই আগ্রহ দেখা গেল জজবাবুকে প্রধান অতিথি করবার—তাছাড়া এমন ভরসাও দিলে, দিদির যদি শরীর ভালো থাকে, সভায় গান গাইবেন। মিত্রা চৌধুরীর গান—ফাঙশান তো ওখানেই মাৎ—কী দরকার আছে সুমিত্র উপাধ্যায়ের! যাক্, ক্লান্তির শেষে বেশ সুখেই ঘুমোচ্ছিল বিকাশ। সুতরাং খানিকটা বেলা পর্যন্তই।

জাগতে হল ছোট বোনের চেঁচামেচিতে—চেঁচামেচিই যার অভ্যাস এবং যদি তাকে বদ্-অভ্যাস বলো, দারিদ্র্যই যার জন্যে দায়ী।

চোখ মেলে বললে বিকাশ,—চা, এনেছিস?

—ঈঃ সুখ কতো! বয়েই গেছে আমার চা-বাহিনী হয়ে তোমাকে জাগাতে!

—তাহলে মুখে ওই হট্টগোল কেন? পাশ ফিরে শুলো বিকাশ।

—বাঃ, এক মহিলা বসে আছেন—উনি পাশ ফিরে শোলেন!

বালিশের উপরই ঘাড় ফিরিয়ে বললে বিকাশ,—কে, মিত্রাদি?

—আমি কী জানি কে তোমার মিত্রাদি—উঠবে তো ওঠো। মেজাজ দেখিয়ে বোন চলে গেল।

বিকাশ উঠল। নিজের তাড়ায়ই উঠল। লোকজন আসতে সুরু করেছে বাড়িতে—এই কৌলিন্যবোধের আভাসে একটু সপ্রতিভ হল তার বসবার ভঙ্গীটাও। তারপর যতোটা ব্যস্ত না হলেও চলত ততোটা ব্যস্ততায় এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়া। তৃতীয় ঘর তো আর নেই। যেটা আছে—তেরপল-ঝোলানো একফালি বারান্দা বা রান্নাঘর।

কিন্তু একী! বৌদি! অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে সশব্দেই বলে উঠতে পারত বিকাশ, —বৌদি? কিন্তু, সংহিতার বেশভূষার পারিপাট্যে বিকাশের বিধবা মা সন্তানের সৌভাগ্য চিন্তা করে মহিলাটিকে আগেই আগলে রেখেছিলেন বলে কোনো সম্ভাষণই বেরোলোনা বিকাশের মুখ থেকে!

সংহিতাই কথা বললে প্রথম,—ঘুমুচ্ছিলেন বুঝি? আমি কিন্তু এঁর সঙ্গে আলাপে দিব্যি জমে গেছি!

—আলাপ! কেমন যেন দৃষ্টিহীনের মতো চারদিকে তাকালেন বিকাশের মা,—আমি কি আলাপ করবার যুগ্যি মানুষ!

এবার বিকাশ মুখ খুললে,—মা, চা দিয়েছ বৌদিকে? না। বলোনা বিনুকে আমাদের দুজনকে দু'কাপ চা করে দিতে।

মা উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু জিজ্ঞাসা ছাড়া নয়,—মুখটুখ ধুলিনে!

—বেড্-টীই হোক না আজ! চা দিয়ে কুলকুচো করে নেব। পাঠিয়ে দাও তো আগে। অভ্যাস ঢাকবার কোনো প্রয়াসই যেন ছিলনা বিকাশের। বা প্রয়োজন।

ছেলেটি সবসময়ই আন্তরিক। ভাবলে সংহিতা। কিম্বা, তার ভাবার প্রয়োজন ছিল। বললে—মুখটুখ ধুয়ে চলুন না আমাদের ওখানে। ওখানেই চা হবে!

মা যেতে-যেতেও দাঁড়ালেন। কী বলে বিকাশ তা-ই শুনবার জন্যে। কোথায় পাবেন তিনি এখন পাঁচ নয়া পয়সা যে এক প্যাকেট চা হবে? আজ কি চা হয়েছে নাকি? তিনি আর বিনতা ঘুম থেকে উঠে হাত গুটিয়েই তো বসে আছেন! সকাল থেকেই মেয়েটা মেজাজ করছে। ওর-ও বা দোষ কী? কুড়িতে বুড়ী হয়েও যখন আইবুড়ো, মেজাজ হবে না? কিছু দেখছে বিকাশ?

—আজ মাপ করবেন, বৌদি! এক্ষুণি ডেকোরেটারের কাছে দৌড়ুতে হবে।

মুখ ব্যাজার করে মা চলে গেলেন।

সংহিতাও একটু বিষন্ন হল তবু আশা ছাড়লে না,—পার্কেই তো দোকান আছে ডেকোরেটারের—সেখান থেকে আর কদ্দুর। তাছাড়া আপনার দাদার শরীরটা ভালো নেই। তাই তো আপনাকে ধরে নিতে এলাম। গোপালকে পাঠালে বাড়ি খুঁজতেই তার একমাস। নিজেই চলে এলাম!

—শরীর ভালো না! কী হয়েছে সুমিত্রদার?

—মেজাজ খারাপ হলেই, জানেন তো, ও'র শরীর খারাপ হয়ে যায়! কারো সঙ্গে কথা নেই! কাল খেয়েছে কি না খেয়েছে—বিকেল পাঁচটায় বেরিয়েছে আর আসেন না—। আটটা বেজে যায়, দশটা বেজে যায় আসেন না। শোভনকে জজবাবুর বাড়ি পাঠালেম—সেখানেও নেই। তারপর ফিরে এলেন প্রায় এগারোটায়। কোথায় ছিলে? কোনো উত্তর নেই। বলুন তো কী বিপদ!

—হুঁ—ঠোঁট দুটো জড়ো করে ভাবলে বিকাশ।—কী জানেন, বৌদি, সুমিত্রদার আজকের সভায় আসা উচিত ছিল। আসবেন না। অগত্যা জজবাবুকেই প্রধান অতিথি করলাম।

এবার পুরোপুরি বিষন্ন সংহিতা। হঠাৎ যেন একটা অদৃশ্য স্পঞ্জ তার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত চুপসে নিলে। ফলে তৎক্ষণাৎ সংহিতা কিছু বলতে পারলনা।

কিন্তু বিকাশ তৎক্ষণাৎই তার ধূর্তামির প্রতিভা দেখালে। একদিন যে তার পাঁচ নয়া পয়সার অভাব ঘুচে হাতে পাঁচশ' টাকা আসবে তারই সূচনা দেখা গেল তার কথায়,—শতো হোক বৌদি, রণেন মিত্তির সেক্স নির্ভর—লেফ্‌ট থিঙ্কার বলতে সুমিত্রদা ছাড়া আর কে আছেন?

আশা-ভঙ্গতাই যেন কথা কয়ে উঠ্‌ল,—তবু তো আপনারা রণেন মিত্তিরকেই আন্‌লেন! ও'র আছে কী? ও'র "ভ্যাঁ করো তো বাপু"—বইটাতে পশুচরিত্র ছাড়া আর কী আছে?

—হ্যাঁ। কিন্তু দেখুন মজা, ওটারই ছবি হচ্ছে আবার!

—শুটিং-টা চিড়িয়াখানায় হবে তো? দুঃখের হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখে সংহিতা।

—হলে ভালো হত! বিকাশ মাথা নীচু করে ঘাড় দোলালো,—কিন্তু কী জানেন, সমস্ত কলকাতাটাকেই তো আবার সোঁদরবন গ্রাস করে নিয়েছে!

মেয়েদের চাইতে পশু আর কে ভালো চেনে বা ভালোও বাসে! সংহিতা চুপচাপ থেকে ভারসাম্যে আসতে চাইল।

বিনতা-বোনটি প্রবেশ করল এবার এ-দৃশ্যে।

—দাদা, তোমার বালিশের নীচে তো কিছু পেলাম না। নেই নাকি?

সর্বদিক থেকে নিরাপদ দৃশ্য থেকে অদৃশ্য হওয়া। তাই প্রস্থান করবার উদ্যোগ করে

বললে বিকাশ,—বৌদি—এক মিনিট। মুখটা ধুয়ে আসছি। বাসি মুখে কথা বলতে নেই।

কিন্তু বাসি লোকের সঙ্গে? ভাই-বোন চলে গেলে ভাবলে সংহিতা। ঠোঁট বেঁকে উঠল খানিকটা। যেখানেই মুখ ধুতে যাক বিকাশ, মনে হল তা আরেক গ্রহে। 'আজ বুঝি তুমি বাসি হয়ে গেছ মনের অনেক ব্যবহারে'—কার যেন একটা পদ্য পড়েছিল সংহিতা। পংক্তিটা মনে আছে। মনে এলো। খুব বেশি ব্যবহার্য নয় বলেই মনে ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে মনে এলো সংহিতার বিকাশও যে পদ্য লেখে। আন্তর্জাতিক কুলী-জাগরণের উপর বিকাশের নজর। কয়েকটা পদ্য উনি দেখিয়েছিলেন। সংহিতা তা থেকে দুটো একটা পংক্তি মনে আনতে চেষ্টা করল। অব্যবহৃত কোনো পংক্তি কি মনে লুকিয়ে আছে? খুঁজে আনলে কাজ হত।

কিন্তু তার আগেই হয়তো বিকাশ বালিশের বা তোষকের নীচে কিছু পয়সা খুঁজে পেয়েছিল, ফলে সে যখন দু'কাপ চা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল—সংহিতা সময় মেপে বুঝে নিলে, চা-টা ঘরে তৈরী নয়, কোনো স্টলের এবং কাপগুলোও তা-ই। প্রথম ধাক্কায় খাবে না স্থির করল সংহিতা কিন্তু সে যখন বিকাশকে খোশামোদ করতেই এসেছে, না খেয়ে উপায় কী? তা-ও সে খুব দ্রুতই ভেবে নিলে।

—চা-টা খেয়ে দু'জনে একসঙ্গেই বেরোনো যাবে—কী বলেন বৌদি? কালো ঠোঁট হাসিতে বিকশিত করে দন্তরুচি দেখালে বিকাশ।

বললেন বৌদি কিন্তু বিশুদ্ধ বেরোনোর কথাও নয়, দাঁত বেরোবার কথাও নয়। চায়ের কথাই,—আপনি না চায়ের উপর একটা পদ্য লিখেছিলেন?

—কোন্‌টা বলুন তো? লিখে তো ছিলাম। চীন-হাঙ্গামার সময়ও লিখেছিলাম, সুমিত্রদাও যখন পদ্য লিখছিলেন। এ-ধারার পদ্যগুলো পড়ে সুমিত্রদা খুব সুখ্যাতি করেছিলেন। বিকাশ সংহিতাকে একটা কাপ গছিয়ে দিয়ে বললে।

কাপের চায়ের দিকে তাকিয়ে সংহিতা বল্‌লে,—হুঁ, উনি বল্‌ছিলেন, বিকাশের একটা প্রাইজ-ট্রাইজ পাওয়া উচিত! দেখছি।

—না-না, আমরা কী প্রাইজ পাবো, বৌদি! বিকাশ যেন লজ্জায়ই কাপে মুখ লুকোলো।

—প্রাইজ-ট্রাইজ দেওয়া ব্যাপারে উনি তো আছেন কোথাও-কোথাও।

টপ্‌ সিক্রেট বেফাঁস করবার ভঙ্গী বৌদির মুখে দেখলেও বিকাশ অন্তত ততোটুকু চালাক যে সুমিত্রদার সঙ্গে মেলামেশা সুরু করবার আগেই এ সিক্রেট-টা সে জানত।

—আছেন। সনিঃশ্বাসে বললে বিকাশ।

শব্দটাতে সংহিতা যেন বিড়ালের মিঁউ শুনতে পেল, হুলোর 'ম্যাও'-ও না। অষুধে কাজ হলনা। ডোজ বাড়াতে হবে। চায়ে চুমুক দিয়ে সংহিতা মুখ তুলে বলে উঠ্‌ল,—মনে পড়েছে—আপনার কবিতার দুটো পংক্তি। 'চায়ের পাতা শুকোতে হবে, ভাজা হবে, তাজা পাতা কালো হবে / গায়ের রঙ কালো হবে আমাদের মতো কুলীর চামড়ার ঘোর কালো।'—তা-ই না?

ঠোঁটের কালো চামড়া কুঁচিয়ে তুলে বল্‌লে বিকাশ,—'টসে'র দোকানে বরাত ঠুকে ঢুঁ মেরেছিলাম একসময়, বৌদি—কিন্তু টসে হেড পড়লনা, টেল পড়ে গেল।

—পড়বে—হেড্‌-ও পড়বে। কাপে আধেকটা চা রেখে হেসে মাদুর থেকে উঠে গেল সংহিতা,—চলুন।

—হাঁ, আপনাকে পার্কে পৌঁছিয়েই আমি সোজা রাস্তা ধরব।

এবার মেয়েলি অস্ত্র ছুঁড়ল সংহিতা, বিষণ্ণ অনুনয়ে বল্‌লে,—আপনার দাদাকে দেখতে যাবেন না একটি বার।

সুমিত্র উপাধ্যায় সব বুঁড়ি ছুঁয়ে রাখতে জানে আর বিকাশ বুঝি তা জানেনা? কাপটা রেখে বললে বিকাশ,—ঝামেলাটা চুকে যাক, বৌদি, সন্ধ্যার পর ঠিক পৌঁছে যাব।

তেইশ

শিববাবুর ইলেকট্রিক্যাল্‌স্‌-এর দোকানের ফুটপাথে দাঁড়িয়েছিল অলক। একা। সামনে যোধপুর পার্কের শিরীষ না তালের দিকে চোখ নাকি পোস্ট-অফিস এলাকার গেরুয়া করবী গাছটায় তা ঠিক বোঝা যাচ্ছিলনা। বিষে বিষক্ষয়। রক্তকরবীর বিষ যে গেরুয়া করবীতে উধাও তা-ই কি ভাবছিল অলক—তার দিদির কথা ভাবছিল? দক্ষিণেশ্বর ঘুরে এসে বস্তুত বেশ ছিল মিত্রা। বিকাশের অনুরোধে গাইতে পর্যন্ত রাজি হল, 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো, প্রভু.....' সভায় গাইতে রাজি হল! কিন্তু না, এ মিরাক্‌ল্‌-এর চাইতে ঢের বেশি সেন্‌সেশান্‌ল্‌ ঘটনা তার মনে। "প্যাথিয়েটে" নয়—যে-ইংরেজি কাগজটায় সে-ঘটনা, তা সে পুলিশের রুলের নক্সায় রোল করে নিজের উরুতেই ঘা মারছিল থেকে থেকে।

শিববাবু গণেশকে ধুঁয়ো খাইয়ে তাঁর কাউন্টারের ওপাশে গিয়ে যে চোখ বুজে ধ্যানস্থ ছিলেন তা-ও অনেকক্ষণ। এখন তিনি ব্যাটারি পরীক্ষায় নিযুক্ত কিম্বা কোনো ফ্যানের মোটর ওয়াইণ্ডিং। তা-ও প্রায় শেষ হয়ে এলো, এখন সহকারী এলেই অলকের সঙ্গে আলাপ জুড়বেন কিম্বা কাউন্টারে বসে কথা ছুঁড়বেন,—সভার কন্দুর, অলকদা?—শিববাবুর দোকানের সামনে যে যুবকদের জটলা হয় প্রায় রোজ, তারা সবাই বয়সে শিববাবুর ঢের-ঢের ছোট হলেও তিনি প্রত্যেকটি যুবককে 'দাদা' ডেকে খুশী। বোধহয় ব্যবসায়িক দস্তুরে নতুবা যুবকমাত্রকেই মস্তান মনে করেন বলে।

কিন্তু শিববাবুর কথা সুরু হবার আগেই দেখা গেল, বিকাশ পোস্ট অফিসের মোড়ে এক মহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, বা তাঁকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে দক্ষিণ-বরাবর রাস্তায় হনহনিয়ে এগিয়ে আসছে। অলকের চোখ-সোজা যখন বিকাশ, এতোটা সময়ের চাপা বাষ্প ভক্‌ করে মুখ দিয়ে বেরোলো অলকের,—এই যে—

ফিরে তাকাল বিকাশ। অলককে দেখতে পেলে। হাত তুলে লাল-সেলামের ভঙ্গীতে হয়তো অপেক্ষাই করতে বললে তাকে। কেননা, সামনের ওই ডেকোরেটারের দোকানে তার এখন জরুরি কাজ।

অপেক্ষা করতেই হল অলককে। সত্যপ্রসাদের কারখানা কি আজ ছুটি? ওই সর্দার মজুরটা এলেও অভিদার কাগজের নিউজ-লিটারেচারটা নিও-লিটারেটটাকে বলা যেতো! শিববাবুর কাছে ওটা বলা আর ওঁকে কালী সাজানো এক কথা! কালী ব্যানার্জির মতো স্মার্ট অভিনয় মোটেও করবেন না, মা কালীর মতো জিব কেটে বল্‌বেন,—ছি-ছি, সম্মানী লোকের নামে মিথ্যে বদনাম—কাগজগুলোর পেশাই হয়েছে আজকাল তা-ই। উপাধ্যায় তাঁর খদ্দের—সুতরাং সম্মানী ব্যক্তি!

অলক এবার পায়চারি সুরু করলে। যেন আওরঙ্গজেবের ভূমিকায় দারার মুণ্ডাদণ্ড হাতে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে দানীবাবু পায়চারি করছেন। সেকাল থেকে একালে এসেও না

ভুললাম আমরা পায়চারি, না মুণ্ডাদণ্ড! গীতামাহাত্ম্যে সম্প্রতি অবসর-প্রাপ্ত বিচারক শশাঙ্কশেখর যদি তা ভুলে থাকেন!

কিন্তু তাঁর বাড়িতে সংবাদটা কীভাবে গৃহীত হল? সুপ্রিয়টাও বেরোচ্ছে না—কী করে বা জানবে অলক? সুব্রতদার বন্ধু উপাধ্যায়! একটা বিশ্রী আবহাওয়া ওবাড়িতে নিশ্চয়ই। জজবাবু প্রধান অতিথি হতে না বে'কে বসেন! আচ্ছা করে যজাবেন তাহলে বিকাশকে!

অভিদার কাছে একবার গেলে হতো! পারমিতা তো এখন মা—সবকিছু নিশ্চয়ই মুছে গেছে এখন সবার মন থেকে। এমনকি পারমিতার মন থেকেও। আমার? অলক প্রতীক্ষার অসহিষ্ণুতাটাকে প্রেম-বিষয়ক চিন্তায় মগ্ন করে দিতে চাইল। ডান-ইতো বলেছিলেন—গুরুদেবও যাঁর প্রেমের অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ ছিলেন—ডান, হুঁ জন ডানেরই এ-কথা—

Love is a growing, or full constant light;
And his first minute, after noone, is night.

অনেক মূর্খ আছে বিশ শতকের মানুষকে যারা আঠারো শতকীয় ফিজিক্যাল ভাবে—বিকাশ তো হস্তিমূর্খই কিন্তু এ-এলাকাটাই বোধহয় তা-ই। পণ্ডিতমূর্খ উপাধ্যায় বা কী! তিনি নাকি রবীন্দ্রনাথ! মেটাফিজিক্সের ছিটে-ফোঁটা তোর হাড়ে নেই, তুই কিনা রবীন্দ্রনাথ! তোর night কী? বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাতের কাগজের রুলটা দিয়ে একটা গুঁতো দিলে। পদ্য তো লিখেছিলি, বুঝিয়ে দে না ডানের night মানে কী? স্বপ্নকে মানিস জীবনে, প্রতীক বুঝিস?

কিন্তু কে লিখলেন, 'নটোরিয়াস নাইট ক্লাব'-এর প্যারাটা কাগজে? অভিদা? উহুঁ। অভিদার স্টাইলই এমন নয়। এতোটা অবজেকটিভ নন অভিদা। দৈনিক কাগজ ছেড়ে দিয়ে সাহিত্যের বাজারে এলে তিনি তরুণ মহলকে নাচিয়ে তুলতে পারতেন শুধু জার্নাল লিখেই। যদিও ওই কুখাদ্য খেতে নেই তবু মদের বিকল্প পানীয় তো বটেই ওধরনের সাহিত্য! ক'জন তরুণ আর রুফক্সে যেতে পারে, একটা সাপ্তাহিক কেনা কারো পক্ষেই কঠিন নয়!

এতোক্ষণে তবু রুফক্স-যানেওয়ালাকে দেখা গেল। সুপ্রিয় আসছে। এদিকেই আসছে। সুপ্রিয়কে অলক মনে-মনে চাইছিল। টেলিপ্যাথি। কিন্তু টেলিফোনেই যেন কথা বলে উঠল অলক,—হ্যালো—

সুপ্রিয় হাসছে। শরীরের দুলুনিটা একটু বেশি। তাই মনে হল। অলকও হাসল।

দোকান থেকে কথা ছুঁড়লেন শিববাবু,—সভা কখন হচ্ছে, অলকদা?

তার দিকে না তাকিয়েই বললে অলক,—যাবেন নাকি?

—বাঃ, পাড়ার একটা কাণ্ড, যাবোনা?

—কাণ্ড? হাঁ ওটা বেপাড়ায়। এখানে তো ক্রিয়াকাণ্ড!

—ঐ একই!

কাণ্ড বলতে শিববাবু স্ক্যাণ্ডেল বোঝান নি কিন্তু শব্দটাকে ওই মানেতে নিয়ে গিয়ে অলক নিজেই একটু বিব্রত হল। নিজের বাড়িটাকে মনে পড়া স্বাভাবিক। শিববাবুর শেষ কথাটার পর তাই সে দোকানের সীমানা ছাড়িয়ে সুপ্রিয়র দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল।

অলক মেয়েদের উপর বীতশ্রদ্ধ। সুপ্রিয়কে ওমেনাইজার ভাবলেও, সে সঙ্গে অলক এ-ও ভাবে অচিরেই সুপ্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক হয়ে যাবে নিজের ভূমিকা অনুচর রাসভ

অশোককে দিয়ে।

খুব মন্থরে আসছিল সুপ্রিয়। তার মানে তার কোনো এন্‌গেজমেন্ট নেই আজ সকালে। তার মুখোমুখি হবার আগে অলক আবার ডানকেই ভাবলে। উর্বশী আর ফিরবে না। সে গৌরব-শশী অস্ত গেছে। ওদের রাত্রির দিকেই ঝোঁক কিনা বেশি। বড়ো জোর ঊষাকাল পর্যন্ত থাকতে পারে প্রেতিনীরা। হ্যামলেটের নিহত পিতার মতো। রক্তে হিংসার বিষ ঢুকিয়ে দেবার জন্যে! নীলকণ্ঠ সমুদ্র-গরল খেয়ে ফেললেন—উর্বশী ভেনাস জাতীয় সামুদ্রিক প্যারাগন অব অ্যানিমেলসগুলোকে গিলে ফেলতে পারলেন না? পারমিতাকে ভাবলে অলক। দুপুরের পরই রাত্রিতে চলে গেল! ডান দয়া করে দুপুর পর্যন্ত ওদের রেখেছেন। কিন্তু সুন্দরী শুকতারারা সকাল পর্যন্তই শোভা—রোদের আভা এলো কি উধাও। সাধে ওদের পর্দানশীন করেছিল মধ্যযুগ? অন্ধকারেই ওদের মজা। নারীপ্রধান লিচ্ছবীর বৈশালীকে সাধে 'রমনীয় বৈশালী' বলেছিলেন গৌতম বুদ্ধ! ডান রমণীয় রাত্রির কথা ভেবেই যদি প্রেমের আলোকে দুপুরের পরমহূর্তে বিদ্যাপতির 'ঘোর যামিনী'তে ডুবিয়ে থাকেন, সেই দিক্‌ভরা 'তিমিরে' তিনি তাঁর ঈশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছেদই ভেবেছেন নিশ্চয় যেম্নি বিদ্যাপতি ভেবেছেন, 'হরি বিনে দিন-রাতিয়া' কীভাবে কাটাবেন?

ভাবনার এ স্রোত হয়তো মিত্রার ঘাটেও পেঁাছুত কিন্তু ততোক্ষণ সুপ্রিয় এসে অলকের সামনে দাঁড়িয়েছে। 'হ্যালো'র উত্তর মুখে নিয়েই সুপ্রিয় অলককে বললে,—কী হে মুরুব্বি, পদ্মবিভূষণকে ভস্ম করে বুড়ো জজকে তাঁর উত্তরাধিকারী ঠাওড়ালে?

—তা তো হয়েইছে বিকাশের ধূর্তামিতে! এখন দেখতে হবে এ স্পার্কলিং এশেসে আর্নটা আন্‌লেমেণ্টেড কি না—হাতে-ধরা কাগজের রুলটা সুপ্রিয়র দিকে বাড়িয়ে বললে অলক।

—দেখেছি। সুপ্রিয় ডাক্তারি শাস্ত্রে অল্পবিদ্যায় ভয়ঙ্কর এফেক্ট তৈরী করতে চাইল সভার মাতব্বরদের ভেতর,—খবরটা অ্যাল্‌কোহলিকের হ্যালুসিনেশনও হতে পারে!

—অ্যালকোহলিক হলেও অভিদা পারমিতার বাবা—একটু তির্যক হয়ে উঠল অলকের মেজাজ,—জজবাড়ির রায় কি প্যারাটা অভিজিৎ রায়ই লিখেছেন?

—জজসায়েব তো তা-ই দিলেন। উপাধ্যায়ের কাছে বাবা শুনেছেন, একবার না কি তোমার অভিদা উপাধ্যায়ের সাহিত্যকেও আক্রমণ করেছেন।

—তারই লেমেণ্টেশন চলছে বুঝি উপাধ্যায়ের এখন তোমাদের বাড়ি বসে?

—ধেৎ—উপাধ্যায় আর আসবেন ভেবেছ। কিন্তু তোমাদের মুস্কিল হতে পারে। বাবা তোমাদের সভায় প্রধান অতিথি না-ও হতে পারেন!

—বললেন নাকি তোমাকে?

—আমাকে! বিচারক তাঁর ক্রিমিন্যাল ছেলের সঙ্গে কথা বলেন! নাটকীয় হাসি হেসে উঠল সুপ্রিয়।

—কোথায় শুনলে তাহলে?

—বাবা-তে দাদাতে বৈঠক হচ্ছিল টেলিফোনের ঘরে। টেলিফোনে গিয়ে জনশ্রুতি নিয়ে ফিরলাম। ইভসড্রপিং নয়!

—না-না তুমি আড়ি পাতবে কোন্ দুঃখে? যা করবে সবার চোখের উপর! উপাধ্যায়ের মতো পদ্মে বিভূষিত নও তো!

—তা বলে ড্রেনের গন্ধ পেতে চেয়ো না কিন্তু আমার শরীরে। অশোক—ড্রাগনের

শুঁড় থেকে গীতা-উদ্ধার করে একাদশ অবতার হয়ে গেছি!

—গীতা? ও, তোমার সেই যোধপুরী বেগম!

সুপ্রিয় হাসিতে ব্যঙ্গধ্বনি শুনিয়ে বললে,—আচ্ছা কম্প্যারেটিভ লিটারেচার, বলতে পারো, বেগমের সঙ্গে আমাদের রূপকথার ব্যঙ্গমীর কী সম্পর্ক?

—বুঝতেই পারো, ব্যঙ্গার্থে বেগমরাই সব ব্যঙ্গমী—সোনার খাঁচার পাখী!

—তাই বলো! আমিও ভাবছি, স্বর্ণকারের আত্মহত্যার দিনেও কেন আমাদের বেগমদের এমন সালঙ্কারা কন্যা সাজবার ঝোঁক!

সোমাকে মনে পড়ল অলকের গীতাকে নয়। যে-মেয়ে ছিল কণ্বমুনির আশ্রমের শকুন্তলা সে আজ দুষ্মন্তের প্রাসাদে এসে হীরামুক্তামাণিক্যের ছটায় কী একটুও ছটফট করে উঠছে না? বৌভাতের দিনের সোমার মুখটা মনে আনতে চাইল অলক! শার্ঙ্গরবকে দেখে শকুন্তলা চমকে উঠেছিল! মনে কি পড়েনি তার শুধু সপ্তপর্ণী হাতে নিয়ে আশ্রম থেকে বিদায় নেবার দিনগুলো? এই আষাঢ় কি আসবে না তার বহুযুগের ওপার হতে? মনে পড়বে না কবির ছন্দে গাঁথা বর্ষামঙ্গল। 'দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ—পরো দেহ ঘিরি মেঘনীল বেশ।' লাল বেনারসী পরা সোমার মনে কি পড়বে না সেই দিনগুলো? হয়তো মনে পড়বে না। হয়তো পড়বে। দিদির কি মনে পড়েনি তাঁর সমস্ত অতীত—সমস্ত অতীত বজ্রগর্ভ মেঘের মতো ফেটে পড়েনি কি সেদিনকার সে-চীৎকার? তিনিও তো শান্তিনিকেতনের মেয়েই ছিলেন। কাল কি দক্ষিণেশ্বরে দেখে এলেন তিনি বিদ্যাপতিরই সেই রাত্রি: 'তিমির দিক ভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরিকো পাঁতিয়া—' ডানের স্থির আলো সেই তমসাবৃতার চোখে কী অস্থির অথবা নিমগ্ন। কালের উৎসমুখ দেখেই কি দিদি স্থির হয়ে গেলেন? সুস্থ? যে গূঢ় তমসা ফ্রয়েডের উপলব্ধিতে ছিল না—তাঁর 'ইদ্' যে-ইদমের নাগাল পায়নি—যা শুধু ভারতের উপলব্ধিতে ছিল—ছিল ভারতীয় প্রতীকে—কালির রহস্যের কালিকা-মূর্তিতে, তার সান্নিধ্যেই কি নিরাময় হয়ে গেলেন না দিদি?

হঠাৎ অলককে চুপচাপ দেখে একটু বিব্রত হয়েই যেন সুপ্রিয় বল্‌লে,—তোমাদের শান্তিনিকেতনের মেয়ের কথা বলছিনে—সোমার কথা! ধরো মলু—বা উপাধ্যায়ের শ্যালিকা—ওরা তো পড়াশুনো করছে কিন্তু সোনালি সাজবার কী লোভ!

অলক যেন স্বপ্ন থেকে কথা বলে উঠল,—সোমা! গীতা সোনালি পাউডার চুলে মাখে না তো, ওর জামাইবাবু যেম্নি চন্দনের গুঁড়ো গায়ে মাখেন?

—তাতেই কি আর চন্দন হওয়া যায়? দাদা আজ সত্যি মোরোস্। জওহরলালের মৃত্যুতেও তাঁকে এমন দেখা যায়নি।

—সুব্রতদা? হ্যাঁ, তোমাদের বাড়ি তো উপাধ্যায় আসতেন। এখনো যেন অলকের কথাগুলো সংশ্লিষ্ট হচ্ছিল না।

—তুমি কি মনে করো না উপাধ্যায় ডুম্‌ড হয়ে গেলেন!

—কী জানি!

—অবশ্যি ডক্টর রয় থাকলে হয়তো বেঁচে যেতেন! ডক্টর রায়ের মতোই চাপা হাসিতে সুপ্রিয় মুখটা প্রশস্ত করে তুলল।

হয়তো সুপ্রিয়র এ হাসির সঙ্গে অলক তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা ডক্টর রায়ের ফুল্‌-ফিগার অয়েল-পেণ্টিংটার মুখের হাসি মেলাতে চাইল, হয়তো বা অধ্যাপকদের উপরই সুপ্রিয়র এই দুর্বোধ্য হাসিটাকে ছড়িয়ে দিয়ে সে নিজের জামাইবাবুর কথাই ভাবলে।

কিম্বা সব জামাইবাবুর কথা, যারা শ্যালিকাদের শরীরের উপর দাবী জানাতে একটুও ইতস্তত করে না। যা-ই সে মনে-মনে করুক বা ভাবুক, সুপ্রিয়কে শুনিয়ে সে বললে, —চরিত্রহীন!

—কে, আমি! হেসে উঠল সুপ্রিয়,—তাহলে তো শিল্পী হয়ে গেলাম!—'মদনভস্মের পর' কবিতাটা পড়েছ নিশ্চয়, চরিত্রহীনতায় শিল্পীদের আর 'মনোপালি' নেই।

—তাহলে তো জমিদারির মতো চরিত্রের পরগাছাটা উচ্ছেদ হয়েছে, বলো! বাঁচা গেল! চরিত্র নিয়ে যে কতো ভুগেছি!

কিন্তু এই চরিত্রহীনতার আলাপে সাক্ষাৎ চরিত্রের মতো ঋজু দেহে এসে প্রবেশ করল বিকাশ,—এক-কথায়ই ডেকোরেটার কাৎ। কাতের খবর বলতে সুপ্রিয়কে দাঁত দেখাতে হল তার,—যাঁহাতক শোনা আপনার বাবা প্রধান-অতিথি, হাতজোড় ওম্নি। বললে,—তা-ই দেবেন। সভা-টভা হয়ে গেলেই, যা পাওনা হয় মিটিয়ে দেবেন।

সুপ্রিয়কে খুশী দেখাল না। অলক কাগজের রুলটা বিকাশের হাতে গুঁজে দিয়ে বললে,—পড়ো। ফিফ্‌থ্ পেজ।

—কী? হতভম্ব হয়ে গেল বিকাশ।

—উপাধ্যায়ের নিউজ। এনাদার মিঃ হাইড।

নির্বাক হয়ে বিকাশ বানরের চুল-বাছার ভঙ্গী আঙুলে এনে পৃষ্ঠাটা বার করে চোখ নিঝুম করে ফেলল।

সুপ্রিয় বললে,—মনে হয়, মলুর আর গীতার ধারণাটাও ভালো নয়—জানো অলক, রাদার আনকাইণ্ড—ওদের মুখে যতোটুকু শুনেছি উপাধ্যায় সম্পর্কে, তাতে মনে হয়!

—হুঁ।

—জানো, মেডিক্যালম্যান অনেকে বলেন, মানুষ যখন মারা যায়—তার শরীরের সব দুর্বলতা একসঙ্গে কথা বলে ওঠে। ভাবছি, উপাধ্যায়ের বেলায় তা-ই হল কি না।

বিকাশ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বললে এবার,—সুমিত্রাদাকেই যে এসব লেখা হয়েছে তা হয়তো অনেকেই বুঝবে না। নাম তো নেই।

—নামটা লালবাজারে ঠিকই থাকবে। এবং এ-লালবাজার চাইনীজ রেড্ নয়। সুপ্রিয় অলকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে।

বিমূঢ়ের হাসিতে বললে বিকাশ,—বৌদি নিশ্চয় খবরটা দেখেছেন!

চব্বিশ

ওস্কার ওয়াইল্ডের নায়ক ছাড়া অভিজিতের কৈশোরে কোন্ পুরুষ বা আয়নায় বারবার গিয়ে দাঁড়াত? সচ্চিদানন্দের যে-ভাই শহরের শৌখীন নাটকের অভিনেতা ছিলেন এবং প্রচুর মদ্যপান করে চল্লিশ বছর বয়সে লিভার সিরোসিসে মারা গেছেন—তাঁর যৌবনে, অভিজিৎ তাঁর মুখেই ওস্কার ওয়াইল্ডের নাম প্রথম শোনে। এবং নিজের যৌবনে ওস্কার ওয়াইল্ড পড়বার সময় জানতে পারে বোদ্‌লেয়ারের 'বাবুরীতি'র উত্তরসাধক ছিলেন এই দ্রোহী সাহিত্যিক। চির যৌবন কে না চায়—যযাতি তাঁর বার্ধক্যে চান নি? গ্যেটে-রবীন্দ্রনাথ চান নি? সচ্চিদানন্দ চান নি? তা-ই যদি না হবে, যুবতী নার্সের কী দরকার ছিল তাঁর? ইচ্ছে করলে মা বা গৌরী ওটুকু কাজ করতে পারতেন। বাবা চাননি, তাই

ওঁরাও করেন নি। ভেবেছে কোনো-কোনো সময় অভিজিৎ। ভেবেছে মেয়েলি পুরুষদের, যাঁরা আয়নায় দাঁড়ান বারবার অথবা যৌবন চান। মৃত্যু ছাড়া আর কোনো সত্য যে-জীবনে নেই—সে-জীবনের যৌবন মুখোশ ছাড়া কী?

প্রত্যেকদিন মদ খাবার সময় মৃত্যুকেই ভেবেছে অভিজিৎ এবং নেশার মুখোশ পরেছে —যা যৌবন ফিরিয়ে আনতে পারে। যখন নেশা থাকে না তখন সে সত্যের কতো কাছাকাছি। বৃদ্ধ। মৃত্যুর সন্নিকটে।

অ্যালকোহলিকের মতো সকালেও তাই যৌবন-রস পান করতে সুরু করেছিল অভিজিৎ, মদকে হলাহল ভেবেও।

আজ পয়লা জুন। তার আগে পয়লা মে ছিল। মে ডে। দিনটাকে হিটলার পালন করে তার রংটা ব্রাউন করে দিয়ে গেছে। তাই তো ব্রাউন মে ফ্লাওয়ার! গেরুয়া। কেন যে এ-ফুল শুক্লার বাগানে! অল্প নেশায় কাল রাত্রির ঘটনা স্মৃতি হয়ে গেছে। শুক্লার বাড়িটা নর্ডিক হিটলারের বের্লিন হয়ে গেছে যেন। বিয়ার সেলার! হ্যাকার ব্রাউ বিয়ার! আজকাল আর পাওয়া যায় না। ওয়েস্ট জার্মেনীতে অমিতব্রত কী খায়? বেশ আতিথেয়তা শুক্লার। বিদেশী মহিলাদের মতো। বেশি পড়াশুনো করেই মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মনে হয়। অ্যাল্‌কোহলিক! সন্দেহ হচ্ছে, সত্যি উপাধ্যায় তার শালীতাহানির চেষ্টা করেছিলেন কি না—না কি ওটা অ্যাল্‌কোহলিক শুক্লার স্রেফ হ্যাল্যুসিনেশান। নিউজটা বেরিয়ে গেল! একটু অস্বস্তি অনুভব করছিল অভিজিৎ। woman is paragon of animal-beauty! শুক্লার হাসির স্মৃতির সঙ্গে অ্যালসেশিয়ানের ডাক মিশিয়ে শ্রুতির পরীক্ষা করল অভিজিৎ। হাসল মনে-মনে। আত্মজীবনীতে বলেন নি জওহরলাল, কতোদিন পরে কুকুরের ডাক শুনলাম!

একা একা কথা বলছিল অভিজিৎ। কুসুম চা দিয়ে গেছে। গৌরী আসেনি। গোসাঘরে। দোষ নেই। পারমিতার পুরোৎসবে তো উপস্থিত থাকে নি অভিজিৎ! শুক্লা। ডেসডিমোনার শুভ্র রুমালের মতো শুক্লাকে হাতে নিয়ে ওথেলো বলতে চাইল : ইট্ ইজ দ্য কজ্! শুক্লা না গৌরীর মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে! মল্লিকাকে জানে না সে। গোপন রাখতে পারত যেকালে অভিজিৎ সেকালের ঘটনা মল্লিকা। এখন সে মৃত্যুর অনেক কাছাকাছি। গ্রীণ্টানদের মতো কিছুই গোপন রাখতে চায় না—যেমন শুক্লাও। কিম্বা গোপন রাখতে পারে না।

শুক্লার সুরেলা গলার একটা কথাই এখন অভিজিতের শ্রুতিতে বেজে উঠল,—জানো রয়, আমি মনের কামারশালায় আমার জাতির জন্যে বিবেক গড়ে তুলতে চাই! বোধহয় জয়েসিয়ান কথা। জাতি, বিবেক কে এসব। কার প্রতীক? মেয়ে? মেটিয়ার্কি? শুক্লার বিয়ার সেলারে ওকে মেয়ে-হিটলারই মনে হল নাকি কাল? কী সচ্ছন্দে সাম্যালকে আর আমাকে 'তুমি' বলে গেল। যেন আমরা গোয়েবল্‌স্-গোরিং! মন্ত্রী-সেনাপতি! হ্যাগনার শোনাতেও চেয়েছিল। রেকর্ড না কি আছে! পুরোপুরি সিম্বলিক শুক্লা! আমাদের জাতীয় সমাজতন্ত্রের মেয়ে! বণিকপুত্র শালিগ্রামটা কেন? স্বতন্ত্রপার্টির কোনো রূপ? জজবাড়ির সুব্রত বলতে পারে! বেচারি উপাধ্যায়! লালশিবিরে পা বাড়িয়ে গ্যাস্‌চেম্বারে যাবে এখন।

কিন্তু কী আন্‌ফর্‌গেট্‌বল্ ভয়েস মেয়েটার—জিনের মিহি নেশায় অভিজিৎ যেন শুক্লাকে ওর বয়সের পনেরো বছর পেছনে ঠেলে নাৎসী জার্মেনীর কোনো মার্লিন ডিয়াট্রিক

বানিয়ে গান শুনতে চাইল : 'ফলিং ইন্ লাভ্ এগেন'। কিন্তু ধুয়ো উঠছে—কালকের দৃশ্যটা থেকেই ধুয়ো উঠছে! শালিগ্রাম আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে সবার ঠোঁটের সিগারেটে। শুক্লারও! মাতাল বেটি ডেভিসের অভিনয় দেখছিল অভিজিৎ। ইট্ হ্যাপেন্‌ড্ ওয়ান-নাইট!

আধবোঁজা চোখের উপর পিছির ঝালর, নীলচে ধুয়োর পেছনে আধবোঁজা স্বর, —কে বলতেন, শালিগ্রাম—মালার্মে? 'আই পুট সাম্ স্মোক্ বিটুইন্ দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ড মিসেলফ'?

অভিজিৎ দাঁড়াল। মা-বাবার কাছে যেতে হয়! জয়েসীয়ান নায়কের মতো অনুশোচনায় চীৎকার করে উঠতে চাইনে আমি ওঁদের মৃত্যুর পর,—তোমরা আমায় বাঁচতে দাও! অপরাধ সে সন্তান হিসেবে অনেকেই করেছে। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় বাড়ি না ফেরবার অপরাধ বুঝি অসহ্য। কার মনে, মা-বাবার? তা সে জানে না। নিজের মনেই যেন অসহ্য। শুক্লার সেলার তবু যা হোক, পার্গেটরির আগুন। অপাপবিদ্ধ হতে ইচ্ছে করছে তার! কিন্তু নেপথ্যের রাজা কি তার বরাবরই শুভ্র নয়—ধোঁয়ার আড়ালের রাজা? তার পানাসক্তি কি তাকে ইনার সেল্‌ফের মুখোমুখি বসতে শেখায়নি?

পর্দা ঠেলে বারান্দায় যাচ্ছিল অভিজিৎ—সামনে গৌরী। পারমিতার মা। কাল যে পারমিতা মা হয়েছে। যে পারমিতার মুখে 'গ্যাস্' কথাটা কী হাল্কা, কী সহজ! দম বন্ধ করে দেয় না—জমাট করে দেয় না রক্ত। কিন্তু দিয়েছে তা কতো উদ্বাস্তু ইহুদী ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও সেদিন। সমস্ত বাঙালীর উদ্বাস্তু হতে ক'দিন বাকি?

তবু যেন বারান্দায় এসে গৌরীর শরীরে একটা মায়ের গন্ধ পেল অভিজিৎ। বলা যায়, একটা সুষমার গন্ধ; মিষ্টি, স্বাদু গন্ধ। তার ছেলেবেলাকার বড়ো রান্নাঘরের গন্ধ। গ্র্যাণ্ডের টেবিলে যা নেই—গৌরীর ডাইনিং টেবিলেও যা ছিল না। শুধু মার রান্না-ঘরেই ছিল, ডালে-ডালনায়, শুকতোতে, ভাপের মাছে, পায়েসে, লুচিতে, মালপোতে, কলা-পেয়ারা-শশা-কমলার গন্ধ মেশানো ভোগের আতপ চালে! গৌরীর টেবিলে কারখানার তৈরী জেলিতে কি সে গন্ধ ছিল? মালপোর গন্ধ টোস্টে? কিন্তু নিখুঁত পেলো মার রান্নাঘরের গন্ধ অভিজিৎ এ বারান্দায়—গৌরীর সঙ্গে।

—হাসপাতালে টেলিফোন করেছ? গৌরী বললে।

—ওটা তো জয়ন্তরই জানানোর কথা, তা-ই না? খুব তন্ময় হয়েই বললে অভিজিৎ।

—কাল জয়ন্ত বলে গেছে, আজ হাসপাতালে যেতে পারবে না—ওর বোনকে দেখতে আসবে আজ!

—কী করে জান্‌ব, বলো—পালিশ ঠোঁটে হাসল অভিজিৎ,—আসা তো হল না কাল আমার। এমন ধরে পড়লেন কাল মহিলা!

—কে? মিসেস্ সান্ন্যাল? খুবই নিস্পৃহ শোনালে গৌরী। সব বয়সী মেয়েই স্বামীকে সন্দেহ করতে পারে কিন্তু গৌরী তা কোনো বয়সেই করেনি। হতে পারে বিয়ের আচার থেকেই এ-বোধ জন্মেছে কিম্বা পরবশ্যতার ঐতিহ্য জন্ম দিয়েছে এ-বোধ যে সন্দেহ করে লাভ নেই।

—বলতেও পারো! শেষটায় না অলকদের বাড়ির মতো একটা ডিভোর্স হয়ে যায়! অভিজিৎ হাসিটাকে হার্দ্য করলে।

পারমিতা যার মেয়ে, 'ডিভোর্স' শব্দটাকে অলুক্ষণে ভাববার তার সঙ্গত কারণ আছে।

গৌরীর ভুরু কুঁচকোল খানিকটা। বললে,—থাক্। তুমি কোথাও বেরোচ্ছ—

হয়তো নেশায়, কিম্বা একটা নতুন অনুভবে আজকের বারটা যেন ভুলে গিয়েছিল অভিজিৎ,—কী বার আজ? সোম—না মঙ্গল। মঙ্গল আমার ছুটি!

—সোমে তো মঙ্গল-টঙ্গল ভুলে বসে আছো! চোখের হাসিটা তরুণীর তড়িৎ-ঢালা করে গৌরী বললে,—যাও যেখানে যাচ্ছ, আমি ফোন করে জানছি!

—মা-বাবাকে দেখতে যাচ্ছি—

অবিশ্বাসে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দিল গৌরী অভিজিতকে।

সোমরস-টস্ কী যেন বলছিল কাল শুক্লা। রসই হোক আর সুরাই হোক—তাকে এখনো অ্যালকোহলের মতো বিষ ভাবতে পারল না অভিজিৎ। এ এমন এক রসায়ন যার পথে সব-কিছু অমূর্ত। অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট। চোখে অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট আর্ট জন্ম নেয়। বস্তুত—বস্তুবিশ্বই তো এখন মায়া—অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট—নিউট্রন-প্রোটন। পুরুষ-প্রকৃতি আইডিয়া আর ইগো। মেয়েরা তো সাক্ষাৎ অহঙ্কার—পুরুষ অ্যাবস্ট্র্যাক্ট প্রেম। মেয়েদের বাস্তব প্রতিষ্ঠা চাই—অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-অলঙ্কার-যানবাহন সব। পুরুষের মনে একটা বাউল বসবাস করে। কোন্ বিদেশী লেখকও বলেছিলেন কথাটা। সিঁড়ির গোড়ায় যেতে যেতে অভিজিৎ নামটা মনে আনতে চেষ্টা করল। গ্রাহাম গ্রীণ। যিনি থ্রিলার ছেড়ে সাহিত্য রচনা সুরু করেছিলেন! আর আমরা? সাহিত্য ছেড়ে থ্রিলার!

সুমিত্র উপাধ্যায়! সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে উপাধ্যায়কে পাশাপাশি মনে আনল অভিজিৎ। ও'র যে-বইটার চিত্ররূপ দেখেছিল সে—ওটা তো স্রেফ থ্রিলার! সাহিত্য যে উনি কবে লিখেছেন তা জানে না অভিজিৎ। শুক্লা বললে। কাল মাত্র শুনল সে পদ্মবিভূষণ সুমিত্র উপাধ্যায় একদিন সাহিত্যিক ছিলেন।

দোতলার বারান্দায় এসে বাবার ঘরে তাকালো অভিজিৎ। মা-ও নিশ্চয় সেখানে। নার্স তো নেই। 'একদিন আমি শিশু ছিলাম'—কেন যে মনে এলো কথাটা অভিজিতের! গোলাপী নেশায়? না তুলতুলে কোনো শিশুর গোলাপী হাত-পা স্মরণে এনে? পারমিতার একদিন বয়সী বাচ্চাটা কেমন হয়েছে দেখতে? কার মতো?

পর্দা ঠেলে বাবার ঘরে ঢুকল অভিজিৎ। বাবা আধ-শোওয়া। মা বসে আছেন পায়ের কাছে। নেশা না থাকলে হয়তো পতিদেবতার একটা হাস্যকর ছবি চোখে ধরা পড়ত অভিজিতের। কিন্তু এখন সে বাবার পায়ের উপর চোখ রাখল। চোখ ঝাপসা হলেও দেখতে পেলো রুক্ষ—একজোড়া রুক্ষ পা।

গত সন্ধ্যার ব্যবহারে সচ্চিদানন্দ যতো দুঃখিতই হোন, জজবাবু-এঞ্জিনীয়রবাবু-দেববাবু সবার কাছেই অভিজিতের পক্ষ নিয়ে বলেছিলেন : এখন তো কাগজের অফিসেই কাজের পাহাড়—তাই হয়তো জিতু আসতে পারল না—ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল যুগে মশাই, পাল-পার্বন হয়তো উঠেই যাবে। এখনও তেম্নি প্রশান্ত গলায় বললেন সচ্চিদানন্দ,—এসো।

মা দরজায় তাকালেন। কিন্তু চুপচাপ। মুখে কোনো রেখাই নেই যা দেখে কোনো মনোভাব আঁচ করে নেওয়া যায়।

তবু এগোল অভিজিৎ—মার দিকেই এগোল। 'একদিন আমি মার কোলে শিশু ছিলাম' আবার কথাটা মনে এলো হয়তো অভিজিতের—অধিকরণ যোগ করে। 'মার অধিকারে ছিলাম আমি'—কর্ত্রীত্বে ভূষিত করলে মাকে অভিজিৎ। সেই সুগন্ধ পেল আবার। যেন আপেলের গন্ধ। তাকালো বাবার ওষুধপথ্যের টেবিলটার দিকে। না, আপেল নেই। এখন

তো আপেলের দিনও নয়।

—উঁনি চোখে ঝাপসা দেখছেন—ক'দিন থেকেই, বলছিলেন। সচ্চিদানন্দ ছেলেকে স্ত্রীর চোখের দোষের কথা জানালেন, অভিজিতকে মার কাছে সন্তর্পণে আসতে দেখে।

—তা-ই বুঝি, মা? একটু দূরেই থমকে দাঁড়াল অভিজিৎ।

—ঝাপসা দেখাই তো ভালো তারপর একেবারেই না দেখা। মা মাথাটা উপরে-নীচে দুলিয়ে বললেন।

মা সেই যুগের মেয়ে যাঁদের জানা ছিল যেখান থেকে যাত্রা সুরু সেখানেই ফিরে আসতে হবে। পৃথিবীর কক্ষের মতোই তাঁদের পথ। ঋতু ধরে-ধরে ছেড়ে-ছেড়ে আসা। কেন এমন, প্রশ্ন নেই। বাপের স্নেহ থেকে স্বামীর প্রেমে আসা, স্বামীর প্রেম থেকে মাতৃত্বে আসা, মাতৃত্ব থেকে দৌহিত্রের কৌতুকে—তারপরই যদি পিতৃগৃহ থাকত সেখানেই হয়তো ফিরে যেতেন তাঁরা। 'ইন মাই বিগিনিং ইজ মাই এণ্ড'। পিতৃগৃহ নেই মার তাই স্বামীর কাছেই আবার আশ্রয় নিয়েছেন, পুত্রে-দৌহিত্রে লগ্ন হয়ে থাকেন নি। এখন কি স্বামীও আবার খারাপ লাগতে লাগল, যেমি হয়তো লাগত, আমি যেদিন শিশু ছিলাম!

অভিজিৎ একটু কুঁজো হয়ে জিজ্ঞেস করলে,—সব-কিছুই বুঝি তোমার খারাপ লাগছে?

—মরলে ভালো না? জীবন-মরণের ব্যবধান যেন মা বুঝতে পারছিলেন না।

অভিজিৎ সোজা দাঁড়িয়ে বললে,—না।

মানুষকে বিশ্বাসে উজ্জীবিত করতে হলে যেমন বিশ্বাসীর ঋজু ভঙ্গি আনতে হয় শরীরে তা-ই আনলে অভিজিৎ।

সচ্চিদানন্দ বিষণ্ণ মুখে বোধহয় ছোট এলাচ চিবুচ্ছিলেন। অভিজিতের মনে হল এবার যেন পায়েসের গন্ধ পেল সে।

মা বোঁজা-বোঁজা চোখে আর ঠোঁটে হাসি নিয়ে বললেন,—কেন?

—মরবে না। তা-ই।

বাবাকে একটু সুখী মনে হল। বললেন,—তোমার মাকে নিয়ে যাও না কোনো ওপথেলমিকের কাছে—চেনা আছে?

আমার হাতে মার ভার দিচ্ছেন বাবা? কোনোদিন তো দিতে চান নি! কিন্তু অবাক হল না অভিজিৎ। এখন বোধহয় কিছুতেই অবাক হতে নেই। এক্ষুনি যদি মেঝেতে একটা গাছ গজিয়ে যায়। আর শেক্‌স্পীয়রের নাটকের একটা দৃশ্যের মতো তা এগিয়ে আসতে সুরু করে তাহলেও অস্বাভাবিক মনে হবে না অভিজিতের। বলবে সে : চমৎকার!

—বেশ তো, যাওয়া যাবে! রাসবিহারী এভিনিউতেই তো চক্রবর্তীর চেম্বার আছে। কী বলো মা? যাবে। তা-ই তো!

মা হাত বাড়ালেন। কিছু বললেন না।

এইমাত্র কি হাঁটতে শিখেছে অভিজিৎ। এগোলো সে। ভুলে গেল তার মুখে যে দুধের গন্ধ নেই।

মা যেন অভিজিতের মাথাটা নাগাল পেতে চেষ্টা করলেন, অ্যালকোহলিজ্‌মে যে-মাথা শূন্য হয়ে যায় নি। কিম্বা শতকীয় রোগ নিঃসঙ্গতায়।

একটু নীচু হল অভিজিৎ।

মাথায় হাত দিতে পারলেন মা। হাত দিয়ে বললেন,—যাবো।

যে-সময়টায় অভিজিৎ বলে কেউ ছিল না সে-সময়টাকেই কি নাগাল পেল সে, মা যখন শিশু ছিলেন!

মাথা সোজা করে অভিজিৎ বললে,—আজ যাবে? অবশ্য কাল আমার ছুটি।

—কাল। বেশ, কাল।

মাকে কী প্রবোধ দিয়ে এলো সে? সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে ভাবছিল অভিজিৎ। কাল। কাল এবং কাল। টুমরো এণ্ড টুমরো। ডিউপ অব টুমরো ইভ্‌ন্ ফ্রম্ এ চাইল্ড্। মা-হারা শিশু কিন্তু আজ মার ছবি পেল!

বারান্দায়ই ছিল গৌরী। অভিজিৎ জিজ্ঞেস করলে,—পুপু কেমন আছে?

—ভালো।

মাথা নেড়ে 'সেলারে' ঢুকে গেল অভিজিৎ। পারমিতা যেদিন পুপু ছিল। মাথা নাড়বার সময় হয়তো ভাবল সে। যার জন্যে ঘরটার 'সেলার' নাম—সেই ত্রিকোণ টেবিলটার কাছে আর গেল না অভিজিৎ। ত্রৈমাসিক *20th Century* কাগজটা হাতে নিলে ফোনের টেবিল থেকে—কাল শুক্লার কাছ থেকে এনেছে। আজ পড়ে জানাবে কেমন লাগল—বলে এসেছিল কাল। কাল। গত কাল আর আগামী কালের মতো নয়।

পঁচিশ

জজবাবু রাজি হলেন না। পদ্মনাভর শূন্য আসন পূর্ণ করতে রাজি ছিলেন তিনি। কিন্তু যোধপুর পার্কের জনৈক সম্মান-প্রাপ্ত সাহিত্যিকের নামে যখন জনৈকা শিক্ষিতা মহিলার সম্মানহানির অভিযোগ আনা হয়েছে দৈনিক কাগজে, অবসর-প্রাপ্ত হলেও শশাঙ্ক-শেখরের বিচারপতির সত্তা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। সে-উত্তেজনা যখন বিষণ্ণতায় রূপান্তরিত, যা সবরকম উত্তেজনারই পরিণতি, তখন সদলে সুপ্রিয় তাঁর শোবার ঘরে প্রবেশ করে জানলে বাবা প্রধান অতিথি হতে রাজি নন।

বিকাশের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কোথায় একজন মুরুব্বির সঙ্গে হার্দ্য সংযোগে ভবিষ্যৎটা তার ফর্সা হয়ে যেতো—না এ কী সংবাদ।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সুপ্রিয় বিকাশ আর অলককে বোঝালে, কেন একজন কুখ্যাত লোকের আসনে বাবা বসতে নারাজ!

অলক বুঝতে রাজি ছিল কিন্তু বিকাশের মনে অন্য চিন্তা বা অন্যচিন্তা তখন সুপ্রিয়র কথায় মাথা নাড়তে নাড়তে সে বসবার ঘরে এলো। এই প্রথম। এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভাবলে, সুমিত্রদার মতো, এই না শেষও হয় তার।

খানিকক্ষণের জন্যে কৌচে ছড়িয়ে বসলও ওরা তিনজন, একঘণ্টা আগে যেখানে শশাঙ্কশেখর আর সুব্রত চিন্তামগ্ন হয়ে বসে গেছেন।

কিন্তু চিন্তার কোনো বালাই-ই ছিল না সুপ্রিয়র। বললে সে—অলককেই বললে, —বুঝতেই পারো আমি যখন ইম্মর‍্যালিস্ট আমার বাবা কতোটা মর‍্যালিস্ট হবেন। এবং যদি কখনো আমার পুত্র জন্ম নেয় সে ফিরে আবার কতোটা মর‍্যালিস্ট। ইউজেনিক্সের নিয়মই তা-ই।

এ-ধারার বংশালোচনায় বিকাশের মন ছিল না কারণ সে অসচ্ছল পিতার অসচ্ছল পুত্র। অলককে সে-ও বললে,—গে'য়ো যোগীই ভালো—কী বলো, অলক? হিড়িম্বা-

নন্দনকেই বলি।

—ঘটোৎকচ আছেন কলকাতায়? অলক হাসতে লাগল।

—হাতি তো সব মেরে ফেলা হচ্ছে জঙ্গলে! সুপ্রিয় হাসিতে যোগ দিলে।

—নিউ আলিপুর হচ্ছে কি না ও এলাকায়। বিকাশ তার দন্তে শুধু হাসতেই জানে না, দংশনও করতে জানে।

—ব্রিজটা যে ছাই কবে শেষ হবে আমাদের! বিকাশের দাঁত বসল না সুপ্রিয়র চামড়ায়। বসলেও সে-রক্তে বিষের ক্রিয়া নেই, দেখা গেল।

—মিত্রাদি গাইবেন তো, অলক? সভায় মন নিয়ে গেল আবার বিকাশ

কিন্তু জিজ্ঞাসাটা নীতি-দুর্নীতির আবহাওয়ায় ভেসে এলো বলে অলক হাসি নিবিয়ে বললে,—আজ ত দিদি সম্পূর্ণ সুস্থ। তাছাড়া, পণ্ডিতজী তো মেয়েদেরই 'হিরো'-ই ছিলেন!

—হুঁ। স্টেটসম্যান ময়দান-সভার ছবি ছেপে তা-ই দেখাচ্ছে। সুপ্রিয় বললে।

—তুমিও কম যাও কিসে? মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো ড্রাগনের কুণ্ডলী থেকে তুমিও তো কন্যা উদ্ধার করেছ! অলক হাসিতে ফিরে এলো।

—ভালো। সুপ্রিয় নড়ে-চড়ে উঠল,—করব, গীতাকে একটা টেলিফোন? ওর জামাইবাবুর খবরটা পেয়েছে কি না দেখতে হয়।

সুপ্রিয় টেলিফোনে হাত বাড়াল। আবার জামাইবাবু-প্রসঙ্গ! অলক উঠে গিয়ে বিকাশকে টানলে,—চলো যাবে না কি হেরম্ব কবিরাজের বাড়ি!

বিকাশ তড়িৎস্পৃষ্ট মরা ব্যাঙের মতো লাফিয়ে উঠল।

অলক সুপ্রিয়কে বলে গেল,—পূর্বরাগটা জনসমক্ষে করতে নেই—চলি আমরা, সুপ্রিয়।

সুপ্রিয়র আপত্তি ছিল না। কেন না, উপাধ্যায়ে সে মোটেও কৌতূহলী নয়, শোক-সভাতেও নয়—কাল বিকেলে নীলঅঞ্জনঘনপুঞ্জ ছায়ায় অম্বরটি যা সম্বৃত ছিল আজকের ফোরকাস্টও তা-ই, যদি বিকেলে তেমন একটি সম্বৃত অম্বর পাওয়া যায় তাহলে কোনো সতনু মেয়ের 'অসম্বৃত কাঁখের ভিত' দেখবার তো পরম মুহূর্তই বলতে হবে।

বিকাশ অলককে নিয়ে বাইরে এসে বললে,—জজবাবু বাঁকড়োর দুটো ঘোড়া দিয়ে টেবিল সাজিয়েছেন কেন বলো তো! এমন দুটি অশ্বমেধের ঘোড়া বাড়িতে থাকতে?

—কী বলতে চাও, ফার্টিলিটি কাল্ট?

—বড়োলোক বুড়োদের তো ওই আফশোষ, নাতিনাতনীতে বাড়ি ভরে যায় না কেন! চালের দোকান লুঠ করতে হয় না তো ওদের! লুঠ করে যা আলিবাবার ধন এককালে জড়ো করেছেন, মন পঞ্চাশে উঠেও তো ওঁদের মন্বন্তরে ভোগায় নি!

লালশিবিরের বলেই যে বিকাশের জজবাবুর উপর উষ্মা তা তো নয়—সভাটা তিনি পণ্ড করতে চান বলেই তার আক্রোশ স্বাভাবিক—তা-ই ভেবে নিয়ে চুপচাপ হাঁটতে লাগলে অলক বিকাশের পাশে-পাশে।

ডেকোরেটারের কাজ সুরু হয়ে গেছে সার্বজনীন জমিতে।

পাশ কাটিয়ে যাবার মুখে হাঁকল বিকাশ,—ও মিস্ত্রীভাইরা—শেষ করতে পারবে তো পাঁচটায়?

একটি কণ্ঠ শোনা গেল,—লকার মাঠের লোককে তা বলতে হয় না, বাবু!

অলক হেসে বললে,—লকা-ফকা কী বললে হে? আমাকে গালাগাল দিলে না কি?

—এঞ্জিনীয়ারের এলাকার ছেলে যদি অলক হয়—মিস্ত্রির মাঠের ছেলের নাম লকা হতে ক্ষতি কী? বিকাশ হাসলে জজবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই প্রথম।

—শুধু অলকাপুরীই নয় একটা লকাপুরীও আছে দেখা যাচ্ছে!

—সুমিত্রদা বলতে পারতেন ওটা লঙ্কার অপভ্রংশ কি না!

—প্রমীলারাজ্য না কি?

—কে বলবে! মেয়েতে উৎসাহ মোটেও নেই বিকাশের। থাকবার কথাও নয়। বোনটি যে তার ভোর থেকেই লকার মাঠের মেয়েদের মতোই গলাবাজি সুরু করে তার জন্যে যতোটা মেয়েতে নিরুৎসুক সে, তার চাইতে বেশি শুধু এ-কারণে যে মেয়ে নামক সুন্দর জন্তুগুলোকে বিয়ে না দিয়ে উপায় নেই।

—অলকার মেয়েরাই হয়তো অন্য নামে লকার মাঠে আছেন! হাসল অলক।

—সব ভূশণ্ডীর মাঠে! গম্ভীরভাবে বললে বিকাশ!

—ওটা কিন্তু এ এলাকা! দেখছ তো কী পরিমাণ তালগাছ!

—বিশেষ, যোধপুর পার্ক।

দেবাবাবুর বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল ওরা।

—আমরা কিন্তু নারকেলকুঞ্জে আছি!

—ওটাও-ও দক্ষিণীফল। লঙ্কা থেকে আমদানী!

—লঙ্কা-সমসমাজিদের মুখ থেকে শুনেছ না কি?

—তেলেঙ্গানা-কেরালাও হতে পারে। মুখ টিপে হাসল বিকাশ, যা অস্বাভাবিক তার পক্ষে; দাঁত না দেখানোই অস্বাভাবিক।

কেউ-কেটা হয়ে উঠল না কি আজকাল বিকাশ। এই শোকসভাটা না করতেই? তাছাড়া, সুমিত্রদার জন্যেও তো বিশেষ শোক দেখা যাচ্ছে না! ধূর্ত, ধূর্ত! ভাবলে অলক। রাষ্ট্রনীতির পাঁড় মাতালরা যা হয়! রাষ্ট্রনীতিতে গান্ধীজী আর পণ্ডিতজী আনবেন প্রেম-মৈত্রী! স্বয়ং ঈশ্বর নেমে এলেও তা হবে না!

স্টেশন রোডের মোড়ে আসবার আগে ওদের আর কথা হল না। কাছেই হেরম্ব সেনগুপ্তর 'পার্বতী কুঞ্জ'। মায়ের নাম পার্বতী ছিল এ-ধাপ্পাই দিতে চায় হেরম্ব। আসলে, পর্বতভ্রমণ করে এসে খাসিয়া না লেপচা মেয়েদের নিয়ে হেরম্ব একটি পর্নোগ্রাফি লেখে এবং পুজোর হিড়িকে তিন মাসে পাঁচহাজার বই কেটে যায়। ফলে প্রচুর রয়েলটি, আগাম চুক্তি, চিত্র-প্রযোজকের নেক-নজর প্রভৃতিতে অতিদ্রুত 'পার্বতী কুঞ্জ' গড়ে ওঠে। উপাধ্যায়ের সার্টিফিকেটও ছিল এই সাফল্যের পেছনে। সে বলেছিল,—এই নবমহাভারতে আমরা দ্রৌপদীকে নগ্নভাবে চিনতে পারলাম। কিন্তু এই দুঃশাসন-সুলভ দৃষ্টির ফলে হেরম্বের ক্রেতা বাড়লেও, শ্বশুরের কোপদৃষ্টি পড়ল। এসব ঘটনা অবশ্য বিকাশ আর অলক জানে না—সুমিত্র-হেরম্ব প্যাক্টের খবর যুযুৎসু রণেন মিত্র বিলক্ষণই জানে। বিকাশ জানে, সাহিত্যিকরা কেউ কারো ভালো চান না।

—রণেনদা আসছেন জানলে ঘটোৎকচ আবার কী বলে বসে, কে জানে? বিকাশ চিন্তিত মুখে হাঁটতে লাগল।

—কেন, শ্রাদ্ধমণ্ডটাকে কুরুক্ষেত্র ভাববে—হয়নি জীবনানন্দ দাশের বেলায়? আমি অবশ্য জানিনে, শুনেছি! অলক হাসতে লাগল।

চেঞ্জ-ফেঞ্জ বোধহয় কিছু না—কোন্ আত্মীয়ের বিয়েবাড়িতে হয়তো ডেকচি-কড়াই-হাতা-খুন্তি সাপ্লাই দিতে গিয়েছিল হেরম্ব। দেখা গেল সামনের বারান্দায়ই সে আসীন। সামনের ছোট বাগানে কলাবতী গাছ। তাহলেও কলাগাছ আর হাতির শুঁড় ভেবে নিতে অলকের কষ্ট হল না। কিন্তু সিদ্ধিদাতাতে নমস্কার জানিয়ে গেটে ঢুকল বিকাশ।

—হেরম্বদা—আপনার কাছেই আমরা এসেছি। বিকাশ পূর্ববৎ দন্ত-বিকশিত করল।

খবরের কাগজটা—সেই সুমিত্রর নিয়তিবাহী কাগজটা পাশেই ভাঁজকরা ছিল হেরম্বর। চোখ ছিল কলাবতী গাছে, তখনও অপ্রসবা কলাবতী গাছে উদাস। মুখ ফেরালে সে। বললে,—কী খবর? পেয়েছি—তোমাদের নিমন্ত্রণচিঠি পেয়েছি!

আজ হেরম্বকে একটু নরম দেখে দুজনেই হয়তো খুশী হল, দুজনই উঠে এলো বারান্দায়।

—সেই তো বলতে এলাম, হেরম্বদা—বিকাশ ভণিতা সুরু করলে।

বামপন্থী দল রাষ্ট্র অধিকার করলে যে প্রোপ্যাগাণ্ডা মিনিস্টার হবে—মানে ডক্টর গোয়েরল্‌স্, তাকেই দেখতে লাগল চুপচাপ অলক।

—কী? কী? কী বলবে, বলো! হেরম্ব উৎকর্ণ হল।

—সুমিত্রদা তো অসুস্থ। ভীষণ!

বিকাশের কথাটা ব্লটিং পেপারের মতো হেরম্বর মুখ থেকে সবটুকু লাল কালি শুষে নিলে।

নম্রতার গলায় আওয়াজ বেরোলো,—হুঁ।

—তিনি তো সভায় প্রধান অতিথি হতে পারছেন না—আপনাকে এ-দায়িত্ব নিতে হবে, হেরম্বদা।

—আমি? হেরম্ব বোধহয় সুমিত্রর নিয়তির সঙ্গে নিজের নিয়তির সমীকরণ করেছিল: কাগজটা অনিচ্ছুক আঙুলে তুলে নিয়ে বললে,—এই নিউজটার দরুণই হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সুমিত্র।

—না হেরম্বদা—পাশের একটা লম্বা বেঞ্চিতে এতোক্ষণে বসবার সুযোগ পেল বিকাশ,—মাথায় একটু গোলমাল হয়েছিল আগে থেকেই। আজ সকালে বৌদি আমার বাড়ি এসেছিলেন। এই নিউজ পড়ে না কি আনম্যানেজেব্‌ল্ হয়ে উঠেছেন। মিথ্যা বানিয়ে তুলতে একটু ইতস্তত করল না বিকাশ।

—কী সর্বনাশ! মুখে আতঙ্ক ফুটিয়ে তুলল হেরম্ব।

—বৌদি বললেন দুটো পুজো কনট্র্যাক্ট ছিল, দুটোই সকালের টেলিফোনে খতম। চোখ কপালে তুলে বলল বিকাশ।

বেঞ্চির পাশে দাঁড়ানো অপরিচিত ছেলেটির জন্যেই অপ্রকৃতিস্থ হল না হেরম্ব। নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করে বললে,—খুবই দুঃখের খবর!

কিন্তু খবরটা যে দিল তাকে মোটেও দুঃখিত মনে হল না। বিকাশ সেসব তরুণেরই পাঁর হতে চায়, যারা বাবা মারা গেল কতো দ্রুত শবটাকে কেওড়াতলা নিয়ে যেতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চালায়। এ-নিষ্ঠুরতা হয়তো কলকাতার জায়গার অভাবই তৈরী করে তুলেছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যদি বিকাশের মনে কোনো দুরাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়ে থাকে তবে সুমিত্র। অতএব সে নিশ্চয়ই ভাবতে পারে জ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকরা নিপাত গেলেই কনিষ্ঠদের পক্ষে মঙ্গল। কনিষ্ঠ বলতে তো এখন আর একটি-দুটি নয়, শ'য়ে-হাজারে। এতো

কনিষ্ঠের জায়গা কোথায়? হেরম্ব সেনগুপ্ত তো বলেই: ট্রেনের ফার্স্টক্লাস কামরায় আমরা আগে উঠে গা' লাগিয়ে বসেছি—তোমরা, ছোটরা, উঠতে এলে আমরা উঠতে দেব কেন, কেন জায়গা ছেড়ে দেব! হেরম্ব সেনগুপ্তকে দিয়ে কিছু কনিষ্ঠ তাড়ানো—কাজ ফুরোলে পাজী।

—সে-দুঃখ পরে করা যাবে হেরম্বদা—বিকাশ ব্যস্ততার ভাণ আনলে চোখে মুখে এবং অসহিষ্ণুতার ভাণ করে ঘোড়ার মতো পা' ঠুকে।—বলুন—আপনি রাজি। নইলে আমাদের মুশকিলে পড়তে হবে।

—রণেন সভাপতি হচ্ছে? হেরম্ব আর সুমিত্রলগ্ন হয়ে রইল না।

—তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ওঁর পপুলারিটি বাড়ছে কি না।

—ওঁর সাহিত্য-রীতিটি কী?

—উনি তো বলেন। মহাভারতীয়। নিয়তিবাদ। কখনো ভাঙবেন, কখনো গড়বেন।

অসহ্য মনে হল অলকের। না বলে সে পারল না,—ভুলে যাচ্ছ, বিকাশ, ওটা সাহিত্য-সভা নয়, পণ্ডিতজীর জন্যে শোক-প্রকাশ!

—সে তো ময়দানে হয়েই গেছে! আবার কী! বিকাশ ঘাড় ফিরিয়ে হাসল।

অলকের মনে হল, বিকাশের মাথায় একজোড়া শিং থাকলে ওকে বলদের মতো দেখাত না, ঠিক শয়তানের মতোই দেখাত।

হেরম্ব হেসে বললে,—পণ্ডিতজী তো একজন সাহিত্য-রসিকও ছিলেন। আমরা সাহিত্যিকরা না-হয় তাঁর সেদিকটা নিয়েই আলোচনা করব।

অলক মুখ ফিরিয়ে নিলে। পণ্ডিতজীর সাহিত্য-বোধ নিয়ে আলোচনা করবে হেরম্ব সেনগুপ্ত যে কলকাতা বুঝতে ফিরিঙ্গি-কেচ্ছাই বোঝে শুধু এবং তাই বুঝে শহরতলীতে এসে ঠাঁই নিয়েছে!

কিন্তু হেরম্বর কথায় সম্মতির ইঙ্গিত পেয়ে বিকাশ চটপট দাঁড়িয়ে গেল,—পাঁচটায় আমি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাব, হেরম্বদা!

—তা-ই এসো। নির্বিকার চিত্তে বললে হেরম্ব এবং বলে গেল,—তা-ই ভালো। লেখায় বসলে তো আর হুঁশ থাকে না ঘড়িতে ক'টা বেজে গেল! হাসিতেই বিদায় সম্ভাষণটা জানাতে চাইল হেরম্ব।

ওরা যখন স্টেশন-রোডে, ডায়মণ্ডহারবারের দিকে একটা গাড়ি যাচ্ছিল। অলক বললে,—হেরম্বর বারোটা কখন বাজাবি, বিকাশ?

—সে কী? হকচকিয়ে উঠল বিকাশ।

—আমার তো মনে হচ্ছে—কাগজে সুমিত্র উপাধ্যায়কে বেফাঁস করেছিস তুই এবং তোকে যারা পোষ্য নেবে ভাবছে, সেই সাপ্তাহিক!

—কী যে বলিস!

—না-না, ওদের বারোটা বাজালে আমার আপত্তি নেই—আমার তো ইচ্ছে হয় হেরম্বকে ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেনে তুলে দিতে—বাজারে-সাহিত্যিক যখন, মাছের বাজারটা চিনে আসুক। তাছাড়া, ও দরজা দিয়েই তো সায়েবরা তাঁতির বাজার সুতোনুটি ঢুকে ফিরিঙ্গি তৈরী করেছিল—সে-খুরদ্ধর মাটির গন্ধটা শুঁকে আসুক শুঁড় দিয়ে হেরম্ব।

উপসংহার

জজবাবু আজও গীতা-পাঠ করেছেন, মৃত্যুর বা নব-জীবনের জন্যে মন তৈরী করবার জন্যে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

মরজীবনে বিশ্বাস করে সম্প্রতি তিনি অমরতায় আস্থা আনছিলেন। কিন্তু মর-জীবনেই যে বাস-পরিবর্তন করে দিতে হয় তা বসবার ঘরে যাবার আগে তিনি ভাবতে পারেন নি। কাগজটা নিয়ে সুব্রত ময়লা মুখে বসে আছে—যে মুখ শশাঙ্কশেখর কোনোদিন দেখেছেন বলে মনে পড়ল না।

—সুমিত্রকেই কারা ব্রেকমেইল করেছে, বাবা! কথাটা বলবার জন্যেই যেন সুব্রত বাবার অপেক্ষায় ছিল।

—কী ব্যাপার? স্বর্গ থেকে লাফ দিয়ে যেন শশাঙ্কশেখর মর্ত্যে পড়লেন—লাফের আশঙ্কাই ফুটে উঠল এখন তাঁর মুখে। সুব্রতর মুখোমুখি বসে তিনিও রেখাকুটিল করে তুললেন মুখ। অবিশ্বাসের রেখা। মর জীবনে অবিশ্বাস।

—এসব মেয়ে হয়তো রু ফক্সের মেয়ে—কেন যে এদের সঙ্গে মেশামেশি করত সুমিত্র। নিজের 'হায়াসিন্থ' গার্লের কথা ভেবে চিন্তিত হচ্ছিল সুব্রত। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইফে এলে কী হবে, মৌমাছির মতো তো মেয়েরা নয় যে টাকার মধুতে লুব্ধ হয়ে ফুলে-ফুলে ঘুরবে আর সব প্রেম থাকবে মৌচাকে! পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে নিজের একটি মৌচাক চাইবেই টাইপিণ্ডগার্ল—যেখানে সে মক্ষিরাণী। নিশ্চয়ই সুমিত্রকে কোন এক মক্ষিরাণী ভুলিয়েছে সে-সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত। তা-ই সুমিত্রর দুর্দিনে সহানুভূতিশীল হয়েই বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল সুব্রত।

জজবাবু রু ফক্সের নাম এই প্রথম শোনেন নি। সুপ্রিয়র প্রসাদে কানে এসেছে নীল শেয়ালের ইংরেজি নামটা। মেয়ে-ব্যাপারে যে ব্রহ্মার মতোই শিল্পী-স্রষ্টাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না তা জেনেই তিনি পদ্মবিভূষণকে পদ্মপাণি বিষণ্ণ বুদ্ধ ভেবে 'পদ্মনাভ' নাম দিয়েছিলেন। তিনিও তো 'পদ্মনাভ' নাম শরণ করেন শয়নের আগে। তাতে ঘুম ভালো হয়। অন্তত স্বপ্ন। সারা রাত তিনি মৃত স্ত্রীকে স্বপ্নে পান।

—মেয়েরাই অপবাদ দিলেন উপাধ্যায়কে? অপরাধীর মতোই বললেন জজবাবু।

সুব্রত বাবার হাতে কাগজটা রেখে উঠে চলে গেল—যা সে কোনদিন করে না। ঘরে এলো। এলিয়টের হায়াসিন্থগার্ল কি বোণ্টনের না লণ্ডনের? বোণ্টনের মুখ পাতলা। লণ্ডনেরই হবে। তবে এখন তো লণ্ডনেও ভীষণ কীলার হয়। হায়াসিন্থগার্লের কথা-গুলো অস্পষ্ট মনে পড়ল তার : 'আলোর ভেতরের স্তব্ধতায় তাকিয়ে আমি কিছুই তো জানতে পারিনি!' অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের চেলা-চামুণ্ডারা যা বলতে পারে। ইংল্যাণ্ড! মহাযানকে কী পছন্দই না করেছেন টয়নবী! এলিয়ট ব্যাঙ্কে কাজ করবার সময়ই হয়তো বুদ্ধভক্ত। আমাদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইফেও মেয়েরা ভিক্ষুণী হয়ে চলেছে। তবু স্বধর্ম। পরধর্মে লণ্ডন নিহত। আমাদের সেই ভয় নেই। কিন্তু কী জানতে চায় তার হায়াসিন্থ গার্ল বা বাড়ির মেয়েরা? মণিকা, সোমা, মলয়া, মহুয়া? দাঁপশিখার কথা ভাবলো না সুব্রত। মার জীবনের সঙ্গে-সঙ্গেই যা এ-বাড়ি থেকে উঠে গেছে। বাল্‌বই

ভাবলে। তার ভেতরের স্তব্ধতার কথা ভাবলে। গাঁয়ের ছেলে কলকাতায় এসে বাল্‌ব ফিউজ হলে যে মজা পায় তেমন ইতর মজার কথাও সুব্রত ভাবতে পারল না। তার প্রান্তন এঞ্জিনীয়ারিং মন নিয়েই তারের ভেতরকার বিদ্যুৎকে ভাবলে—বাধা পেয়ে প্রজ্বলনের কথা। মণিকা মাঝে-মাঝে দপ্ করে ওঠে! কেন? তারের ভেতরকার সহজ বিদ্যুৎ প্রবাহ—তার সহজ-জীবনযাত্রায় যখন বাধা আসে তখনই দপ করে জ্বলে ওঠে। কম্‌প্লিট কম্‌বাস্টনের স্তব্ধতা নেই—তেল পুড়ে যেখানে লুপ্ত—যেমন মা, যেমন ভিক্ষুণীরা মাটির দীপ জেলে তার দিকে তাকিয়ে নিষ্কম্পভাবে নিজেদের লুপ্ত করতে শিখতেন। এই তো ময়নামতীতে সে-সম্প্রদায়ের বিহার পাওয়া গেছে সেদিনমাত্র! সেদিন থেকে মার দিন—বাংলা-সনের বয়স হবে কমপক্ষে—১৩৭০ বছরের ব্যবধান! একই রকম লুপ্ত করে দেওয়া। বাবার দেয়ালে মাত্র একটা ছবি। মণিকা ভুলেও দেখতে যায়না—প্রণাম করা তো দূরের কথা!

মণিকা ঘরে ছিলনা। অপিসে বেরোবে সুব্রত। তাই সুরেনকে দৌড় করাতে গেছে মণিকা রান্না ঘরে। বাবা-মায়ের মতো স্বামী-স্ত্রী এরা নিশ্চয়ই। সুব্রত ভাবছিল স্নানে যাবার আগে যতোটুকু সময় পাওয়া যায়—ততোটুকু সময় যেন সে আজ ভেবেই কাটাবে।

শেভিং-এ বসল সুব্রত। সে-কিছু দার্শনিক নয় যে কাজ ছেড়ে চিন্তায় মন দেবে। এতোটা সময় যে সে দিয়েছিল তা-ই একটা ব্যতিক্রম। তার সহজ জীবনে একটা বাধার দরুণই এতো-কিছু ভাবা। বাধা সুমিত্রর খবর। ভাবনার পাহাড়টার বাঁকের দিকে তাকাল সে এখন। যোধপুর পার্কের ঝিলের কচুরি-পানা থেকে ময়নামতীর ভিক্ষুণী—জমিদার-অধ্যুষিত মামাবাড়ি মৈমনসিংহের অধিত্যকার ঢাল—তারপর বরাবর দক্ষিণের সমুদ্র-ঘেঁষা বরিশালের শ্বশুরালয়। হায়াসিন্থগার্লের উপকূল আর বঙ্গোপসাগরের উপকূল খুবই কাছাকাছি—উচ্চতায় কি না তা সুব্রত জরিপ করতে পারলনা তবে ছেলেবেলায় শুনেছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা আর কচুরীপানা প্রথম মহাযুদ্ধেরই ফসল। মৃত্যু আর জীবন।

জীবন! কী জীবন জানতে চায় তার অপিসের আলোকিত ঘরে বসে হায়াসিন্থ-গার্ল? কী জীবন? শেভিং-ক্রীমে তেমন ফেনা ছিল না। স্বামী-পুত্র-চাকর-বাকর? এই কি জানতে চায় টাইপিষ্ট মেয়েরা? ডালহৌসীর অপিস-বাড়ির মেয়েরা? বিবাহিতা আছেন কেউ-কেউ, তাঁরা বা কী চান? সংসারের জন্যে টাকা—না স্বাতন্ত্র্যের জন্যে? যতোটা ফেনা উঠল—তাতেই ব্রেড চালাল সুব্রত। মণিকা জজবাড়ির সোনার সংসারের স্তব্ধতায় তাকিয়ে কী জানল যাতে সে মুখর হয়ে ওঠে মাঝে-মাঝে—তারপর অবশ্য ঝিমিয়ে পড়ে।

মুখ পরিষ্কার হতে বেশিক্ষণ লাগল না। কাজের সঙ্গে চিন্তা জড়ালে কাজের গতি বেড়ে যায়। চিন্তা তো একটা পাওয়ার—হর্স-পাওয়ার! সুমিত্র আর আসবে কি? এলে জিজ্ঞেস করা যেতো, অশ্বমনোরথ মানে চিন্তার হর্সপাওয়ার কি না! তা-ই হবে। নইলে ছমাসের পথ ছদিনে কী করে আসা যেতো। সিরাজউদ্দৌল্লার আমলে কী স্টীমার চলেছে—না পালের-জাহাজ! ভারতচন্দ্র তো সেদিনেরই কবি! আদিরসের কবি! কিন্তু রাজনীতির প্যাচ জানতেন! ভারতচন্দ্রকে সুমিত্রর সঙ্গে মেলাতে চাইল এবার সুব্রত মনে-মনে।

স্নানের জন্যে তৈরী হল এখন সুব্রত। তার আগে মার পাশাপাশি মণিকাকে আনতে চাইলে। মণিকার সঙ্গে তার বিয়ে বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা নয়—ভারতচন্দ্রের কালের সে-ঘটনা এখন অবশ্য অহরহই হচ্ছে। কিন্তু মণিকা মার মেজাজের কেন নয়? মাঝখানে ওই মহাযুদ্ধ—যা বিপ্লব এনে দেয়। রাশিয়ায় সেটা চোখে দেখা গেল—লেনিন ভ্রূণহত্যা আইনসঙ্গত করলেন। ও তো আর অহিংস বিপ্লব নয়! মার সময়ে যে কুমারীর ভ্রূণ

জন্মাত না তা তো নয়—বিদ্যারই যখন তা হয়েছিল—কিন্তু তখন সুন্দরদেব সেই বিদ্যাদের বিয়ে করতে হত—অ্যাবরশনিস্টদের কাছে ঠেলে দিত না। কী জানি—আগুনে-চিতার রসটস না কি ছিল!

এ সব চিন্তায় নিজেকে পঙ্কিল মনে করবার ইচ্ছা বোধহয় বিশুদ্ধ বুদ্ধির মানুষেরও হয় না, যদি তাঁরা বিবাহিত হন। চিন্তায় কে পঙ্কিল নয়? কিন্তু সুমিত্র এ কী করতে গেল? সত্য হোক, মিথ্যা হোক এ-সব কেলেঙ্কারি অবশ্য চিরস্থায়ী হয় না। সুব্রত নিজেকে ভাবলে। তার ভেতরের ডার্টি লিনেন যেন বেরিয়ে পড়ছে। ওয়াশ দরকার। স্নানে যেতে দেরি করলে না আর সে।

কিন্তু জজবাবু? খবরটা দু'বার, তিনবার খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়লেন তিনি। ভাবতে চাইলেন, 'যোধপুর পার্কের জনৈক সাহিত্যিক' পদ্মনাভ না-ও হতে পারে কিন্তু সুব্রত যখন সুমিমত্রকেই সন্দেহ করছে, বন্ধু বন্ধুর অনেক গোপন কথাই তো জানে, তখন তিনি আর বেনিফিট অব ডাউটে পদ্মনাভকে মুক্তি দিতে যাচ্ছেন কেন? দ্যান নি কি? এজলাসে বসে এমন বেনিফিট কোনো আসামীকে দ্যাননি কি জজবাবু? সমস্ত কর্মজীবনটা খুঁজতে সুরু করলেন তিনি। ফলে, নিবিষ্ট হতে পারলেন না, অস্থিরতা বাড়ল। উঠে পড়লেন শশাঙ্কশেখর। কোথায় যাবেন? কোথায় যাওয়া যায়।

কাগজটা কোঁচে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। তিনি তার বাবার বিচার করেছেন, খুনীর, শ্লীলতাহানির বিচার করেছেন, সুপ্রিয়র, মলুয়ার বিচার করেছেন কিন্তু নিজেকে বিচারের সময় যখন এলো—তখন শশাঙ্কশেখর বাইরের ঘরের এজলাসে আর বসতে পারলেন না। তার মনে হল, ঘরটা অপরাধের সরজমিন হয়ে গেছে। সুপ্রিয়র জন্যে নয়, সুপ্রিয়র ওই নোংরা অনুচরের জন্যেও নয়, মলুয়ার জন্যে নয়—যে এসে প্রায়ই টেলিফোনে বসে, ঈশ্বর জানেন, কার সঙ্গে কথা বলে—পদ্মনাভর জন্যে কি? পদ্মনাভকে আসামী ভাবতে পারছেন তিনি? না।

নিজের ঘরেই এলেন তিনি—স্ত্রীর কাছে, যিনি দেয়ালে আছেন—এ-ঘরে একদিন ছিলেন, তাই আছেন। কেউ নেই—এ কি হতে পারে? গীতায় বিশ্বাস থাকলে ভাবতে পারে কেউ যে একজন ছিল, আজ নেই? বেশ পরিবর্তন মাত্র। যেম্নি জজের ধরাচুড়ো থেকে তিনি ধুতিফতুয়ায় এসেছেন তেম্নি এ-থেকে নগ্নতায় চলে যাবেন চিতা থেকে প্রেতের শরীরে। নিরালম্ব। বায়ুভুক। আরেক পোষাক যতোদিন না সুব্রত শ্রাদ্ধ করে পিতৃলোকে তাকে শান্তি দেয়। হিন্দু আইন নয়, হিন্দু সংকার—রিচুয়্যাল ভাবলেন শশাঙ্কশেখর। 'মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর'—না। সুব্রতই ত্রাণ করবে তাঁকে পুৎ নামক নরকে যখন প্রেত হয়ে থাকবেন তিনি।

কিন্তু নরকে তো তাঁকে যেতে হবে। কেন? পত্নীর দিকে তাকালেন প্রেত শশাঙ্কশেখর। বিবস্ত্র। নব দেহ। তাঁরই আরেকটি দেহ। এনে দিয়েছিলেন কি পেত্নী—না-না পত্নী। নিজেকে প্রেত ভেবে হঠাৎ স্ত্রীকে পেত্নী ভেবে বসলেন শশাঙ্কশেখর। জজবাবুর পোষাকে ফিরে এসে বললেন : অন্যায়। তাঁর মনে হল এবার তিনি এজলাসে ঢুকেছেন নিজের বিচার করবার জন্যে। পত্নী সাক্ষী। আর গীতা—তাঁর বাইবেল। কে ছোঁবে? পত্নী তো ওটা ছুঁয়েই জীবন্দশায় নিষ্কাম হয়ে গিয়েছিলেন। মানে একরকম ডিভোর্স। এঞ্জিনীয়রবাবুর মেয়ে, এখন বোঝা গেল, লম্পট স্বামীকে ডিভোর্স করেই এসেছে। তা নইলে হিস্টিরিয়া পরমহংসদেবের স্থানে গিয়ে সারতে পারে। মেয়েটি গোড়া থেকেই হয়তো

ধার্মিক। শান্তিনিকেতনে মানুষ। হবার কথাই!

শশাঙ্কশেখর পুত্রবধূ সোমাকে ভাবলেন। শান্তিনিকেতনের স্নিগ্ধ মেয়ে! জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্নার উপর জ্যোৎস্না জড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি বেনারসী-সুতির চান্দেরা শাড়ি দিয়ে। শুভরাত্রি—বৌভাতে। কী করতে পারেন তিনি এই জ্যোৎস্না যদি সুপ্রিয়র মতো অন্ধকারকে ডিভোর্স করে।

অনেক অপরাধীর মুখ দেখেছেন জজবাবু—কাঠগড়ায়—অনেক হয়তো অপরাধ না করেও কাঠগড়ায় অপরাধী, অনেক হয়তো অপরাধ করেও কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে গেছে! বিচারপতি কী সাধ্য, কী যোগ্যতা আছে তোমার বিচার করবার?

জজবাবু দৃশ্য থেকে প্রস্থান করলেন অধোবদনে। কিন্তু শশাঙ্কশেখরও কি রইলেন? কোলে কম্পিত শশকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু শশাঙ্ক। শুনল : 'তুমি করো না, করবার ক্ষমতা নেই বলে।' কে শোনাল, দেয়ালের ওই ছবি না সুপ্রিয়? পদ্মনাভ? মলুয়া? গীতা? শশাঙ্কের ইচ্ছে হল—মুমূর্ষু জন্তুটাকে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্ত্রীর পকেট-গীতাটা বুকে চেপে ধরে। স্বীকার করে, হাঁ আমি ওই মেয়েটিতে লুব্ধ হয়েছিলাম যার নাম গীতা।

গীতাটা হাতে তুলে নিলেন শশাঙ্কশেখর—দেয়ালে তাকালেন। দেয়ালের ছবির অবোধ্য মুখে তাকিয়ে বল্‌লেন,—এখন গ্রহণ করবে তো আমাকে?

আরো কী হত, কী বলতেন শশাঙ্কশেখর বলা যায় না—দেববাবুকে যদি দরজায় দেখতে না পেতেন।

পূর্ববৎ ভদ্রতা দেখাতে হয়তো একটু দেরিই করে ফেললেন শশাঙ্কশেখর তাই পিনাকীরঞ্জনকেই বলতে হল,—ও ঘরে আপনাকে না পেয়ে অন্দরেই ঢুকে পড়লুম।

—অন্দর! তখনও শশাঙ্কশেখর ভেবে ঠিক করতে পারলেন না প্রাক্তন দেববাবুকে নিয়ে কী করা যায়। কী বলা যায় ওঁকে।

পিনাকীরঞ্জন এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঘরেই ঢুকে পড়ল,—ভেবেছিলাম ও-ঘরেই আপনাকে পাব।

—ও ঘরে? শশাঙ্কশেখরের মুখ থেকে পাকা ফলের মতো নিঃশব্দে শব্দটা ঝরে পড়ল।

পিনাকীর খেয়াল হল এবার জজবাবুর মুখের দিকে তাকাতে। তাকালো সে। কিন্তু ডক্টর রায়ের দৃষ্টি তো তার নেই যে রোগীর মুখে একপলক তাকিয়েই রোগ বলে দেবে! তাকিয়ে ভাবলে শুধু পিনাকী আজ যেন সে জজবাবুকে অন্যরকম দেখছে। কোথায় গেল সে হাসি, হাত বাড়িয়ে 'আসুন-আসুন' বলাও বা নেই কেন? কিন্তু যেহেতু সে ফ্রয়েডের রোগী নয়, অন্তত এখনও হয়নি—যা প্রায় প্রত্যেক জমিদার-নন্দনই, তাই জজবাবুর রোগটাও সে বুঝতে পারল না। একটু ইতস্তত করে বললে,—একটা খবর দিতে এলাম আপনাকে। বেরিয়েছিলাম বীমাবাবু আর এঞ্জিনীয়রবাবুর সঙ্গেই বাড়ি থেকে। ভাবলাম, আপনাকে খবরটা দিয়ে যাই।

জজবাবুরও এতোক্ষণে খেয়াল হল যে তাঁকে পরের কথা শুনতে হবে—যা চিরকালই শুনে এসেছেন। শুনে রায় দিয়েছেন। তাই একটু নড়েচড়ে বল্‌লেন,—কাগজের খবরটা?

—না। তবে ওটাও বলাবলি করছিলেন ওঁরা। আমার একটা নিজস্ব খবর আছে কিনা।

—বসুন। ধাতস্থ হলেন শশাঙ্কশেখর। চোখের ইঙ্গিতে খালি চেয়ারটা দেখালেন। পিনাকী চেয়ারে গিয়ে বসলেন, বললেন,—বলতে এলাম—আপনাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

—চেঞ্জে? যিনি কিছুক্ষণ আগে পোষাক পরিবর্তন করছিলেন 'চেঞ্জ' কথাটাই তাঁর মুখে সহজে ফুটল।

—চেঞ্জের পয়সা পাব কোথায়? এখন কি আর বাবার আমল আছে? খবরটার ভেতর ভাঙল না এখনো পিনাকী।

জমিদারের ছেলের যে দারিদ্র্য স্বীকার করবার সৎসাহস আছে তাকে আজ একটা নতুন আলোতে নিয়ে শশাঙ্কশেখর ফর্সা হয়ে উঠলেন। বললেন,—পৈতৃক ভিটেয় ফিরে যাবার মন হল না কি আবার?

—তা কি আর ফিরে পাব? ওখানে হৃণের নজর। পিনাকী তার ইতিহাস জ্ঞান দেখাতে পেরে খুশী হয়ে উঠল,—গৃহিণী রাজি হয়ে গেলেন—যোগাযোগ—অদ্ভুত! বেলুড়ে-দক্ষিণেশ্বরেও বলতে পারেন!

মাঝখানকার গণ্ডায় যেন একটা চুবনি খেয়ে উঠলেন শশাঙ্কশেখর। হেঁয়ালি। এ-ও একটা যোগাযোগ। হেঁয়ালিতে পড়তেই যেন হবে আজ বারবার। বললেন, স্বামী-সন্তত্বা যে এ-পাড়ায় আসছেন তার সূত্র ধরেই বললেন,—এঞ্জিনীয়ারবাবুর কথা বলছেন—তিনি বেলুড়েও যাচ্ছেন না কি আজ—আপনিও সঙ্গীক?

—না-না। হাসল পিনাকী,—এঞ্জিনীয়ারবাবুও কথাটা পাড়লেন আর স্ত্রীও সেদিনই রাজি হলেন। বাঁমাবাবু বাঁশদ্রোণীতে একটা জায়গা নিতে বলছিলেন। গিন্নী তো একালের বিত্তবানের মেয়ে—যেতে রাজি নন। সেদিন এঞ্জিনীয়রবাবুও বললেন, বাঁশদ্রোণীতে গেলে কন্‌স্ট্রাকশানটার ভার ওঁকে দিতে! এতো উঁচুর এঞ্জিনীয়র—ভাবুন, কোথায় নেমেছেন—যা হোক, হিউমিলিটির একটা আশ্চর্য মর্য়্যাল ফোর্স আছে বোধহয়, সেদিনই স্ত্রী বললেন—তোমার ব্যাঙ্কের জমা যা-কিছু আছে তা দিয়ে বাড়ি হয় না—ওই বাঁশদ্রোণী না কি বললিলে ওখানে? আমার জমা, আপনাদের কাছ থেকে কুড়িয়ে যা নিয়েছিলাম, তার অবশিষ্ট যা-কিছু!

গল্পের মেজাজে চলে এসেছিল পিনাকী কিন্তু জজবাবু শুনছিলেন যেন একটা নতুন কথা: হিউমিলিটি। শুনছিলেন পিনাকীর কথায়—ভাবছিলেন এঞ্জিনীয়রবাবুকে, এক মেয়ের অসুখে কী পরিবর্তন তাঁর। চেঞ্জ! বাস-পরিবর্তন। যুক্তির পথে চলে আসছিল তাঁর মন। বিচারে বসলেন আবার এবং যা বললেন তার শেষাংশ বিদেশী শয়তানের উক্তি হলেও বিচারকের,—কী জানেন দেববাবু,—ভক্তদের বিনয়ের জলেই বোধহয় আমাদের নোংরা কাপড়চোপড়গুলো ধেওয়া উচিত! সে জলের রং গিরিমাটির। মানুষের বিচার-ক্ষমতা তাকে পশুর চাইতেও পাশব করে তোলে।

বিচারকের মুখে বিচার-ক্ষমতার নিন্দায় বিচলিত করতে পারত পিনাকীকে। কিন্তু কিছুই তো বিচার করেনি জীবনে। যা হবার তা হবে—এই তার আজীবন ধারণা। বাঁশদ্রোণীতে যে তার বাড়ি হবে, তাতে তার কতোটুকু চেষ্টা? যখন হবার হলই। মাধুরী রাজি—এঞ্জিনীয়রবাবু আর বাঁমাবাবুর প্রস্তাব! এর মধ্যে সে কতোটুকু?

হাসির মেজাজেই বললে পিনাকী, গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশনটা দেখেছেন তো? কী রং? সিমেন্টের রং—এঞ্জিনীয়রবাবুরা ঢুকবেনই তো গেরুয়া রঙের গেট দিয়ে!

দেয়ালের ছবির মুখের গেরুয়া রঙের দিকে একপলক তাকালেন জজবাবু,—আকাশ-

চারীই হই আর স্কাই-স্ক্রেপারই তুলি—জানলেন দেববাবু, একদিন তো মাটিতেই মিশতে হবে সবার। দেখলেন তো জওহরলাল!

—দেখে তো এলাম—হাসতে লাগল পিনাকী,—সার্বজনীন পুজোর আরেক আয়োজন। পামগাছগুলোর আঙিনায় চাঁদোয়া—জওহরলালের পুজো হবে!

জজবাবু কপালে বলি তুললেন, যাতে তাঁকে অনেকটা টি. এস. এলিয়টের চল্লিশের দশকের চেহারার মতো দেখা গেল,—ভাবনা কী জানেন—জওহরলালের সমাজতন্ত্র ছেড়ে না জওহরলালপুজো সুরু হয়—স্টালিনকে নিয়ে তা-ই হয়েছিল।

—চিন্তা কী? তারপর একজন ক্রুশ্চফ আসবেন।

জজবাবু বিনয়ব্রত থেকে পুরোপুরি সমাজতন্ত্রে মন নিয়ে এলেন এবার। ব্যর্নড শ' বুদ্ধিমতী মেয়েদের যেমনি ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র বুঝিয়েছিলেন পিনাকীকে খানিকটা তেমনি ধারাতেই বোঝাতে সুরু করলেন তিনি,—বাবার আমলের কথা বলছিলেন না, দেববাবু? সে যে কী সুন্দর আমল গেছে আমি তো দেখেছি—জমিদারও দেখেছি, চাষীও দেখেছি—রাজায় প্রজায় কী চমৎকার সম্পর্ক। ঠাকুরবাড়ির জমিদারী পদ্মাপাড়ে ছিল—নিশ্চয় জানেন। সাবজজ হিসেবে ও-অঞ্চলে ছিলাম তো আমি। স্বচক্ষে দেখেছি—সেই পিতাপুত্রের সম্পর্ক। সংস্কৃতির আদান-প্রদান। উকীল-মোক্তার-হাকিম-কোবরেজ এঁরা তো প্রজা আর জমিদারের মাঝামাঝির মানুষ? সবারই সেই এক ভদ্র-শালীন আচার-ব্যবহার। চোখের উপর রবিঠাকুরকে দেখলেন না? জমিদারের ছেলে ছাড়া এখনকার ধনপতির বা সমাজপতির কোনো ছেলে বলতে পারবেন,—'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে'? আমরা কী পেয়েছি সে-আমল থেকে তা আজ কেউ বিচার করে—জমিদারী উচ্ছেদ করো; তাতেই সমাজ-স্বর্গ তৈরী হয়ে যাবে! সুন্দর পরিচ্ছন্ন গৃহস্থালী, বয়স্কের প্রতি সম্মান, দরিদ্রের প্রতি দয়া—পাইনি আমরা জমিদারি আমল থেকে? অন্য বিষয় বাদই দিলাম। এখন পাচ্ছি নোংরা বস্তি, নোংরা কথাবার্তা, নোংরা পরিবেশ। গার্হস্থ্যবিজ্ঞান গলা টিপে গেলাতে হয় ইস্কুল কলেজে। বুঝুন।

খুশী হবারই কথা পিনাকীর এবং খুশী সে হলও। এবং তা দেখাতেই যেন বললে,—ছেলেরা এসেছিল সভায় যাবার নিমন্ত্রণ জানাতে—ভেবেছিলুম একবার যাব। যাব না, কী-বলুন?

জজবাবু প্যাঁচ মারলেন কথায়,—পাড়া ছেড়েই যখন চলে যাচ্ছেন, পাড়ায় সভায় আর যাবেন কী করতে?

—আপনিও তো নাকি প্রধান অতিথি হতে নারাজ, শুনলাম!

—হুঁ। জজবাবু একটু থামলেন,—এখন হয়তো রটিয়ে দেবে আমি অ্যান্টি জওহরলাল। বাঁমাবাবুর নামেও তো কতো রটিয়েছে! এঞ্জিনীয়রবাবুর মেয়েদের নামেও কুকথা রটাতে আর কিন্দন—উপাধ্যায়ের নামে কী রটিয়ে দিল, দেখেছেন তো আজকের কাগজে?

সে কাগজ দেখেনি পিনাকী কিন্তু রটনার ঘটনাটা শুনেছে বাঁমাবাবু আর এঞ্জিনীয়র-বাবুর মুখে, যখন তাঁরা বাঁশদ্রোণীর ব্যাপারটা সাঙ্গ করতে এসেছিলেন। বললে তাই,—এঞ্জিনীয়রবাবুর বাড়ির দুর্ঘটনার খবরেই তো মাধুরী রাজি হলেন বাঁশদ্রোণী যেতে। ভয় পেয়ে গেছেন, ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে! উপাধ্যায়ের ঘটনা শুনলে তো আজই বাড়ি ত্যাগ করবেন।

বাঁশদ্রোণী তো নয় যেন বংশীধ্বনি শুনলেন জজবাবু শব্দটায়—পাশে হস্তচ্যুত গীতার দিকে তাকালেন। না-না, কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কি আর বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ হতে পারেন? বঙ্কিমচন্দ্রও তো হাকিম ছিলেন, তাঁর বিচারে শ্রীকৃষ্ণ কি আদর্শপুরুষ হতে পারলেন? ভেবে যেন খানিকটা শান্তি পেলেন জজবাবু, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে আপীল পাঠালেন না, লোয়ার কোর্টের বিচার শিরোধার্য করলেন। আসলে জজবাবু আজ বিচারে বসতেই রাজি নন। অন্য কথা ভাবলেন। মেয়েদের বোধহয় স্কুল-কলেজ আছে আজ—তাই সোমাকে দরকার। সোমাকে ডাকলেন তিনি, দেববাবুকে সরবত দেবার জন্যে।

পিনাকী জজবাবুর ডাক-হাঁকে এমনি মোচড়াতে সুরু করলে যেন কেঁচোর গায়ে নুন পড়েছে,—কেন আর বাড়ির মেয়েদের খামকা কষ্ট দেওয়া বলুন, তো—আপনার সৌজন্য, আতিথেয়তা আপনাদের ছেড়ে গেলেও চিরদিন মনে থাকবে।

এবার ঠিক হিউমিলিটিতে দীক্ষিত হয়ে উঠলেন জজবাবু,—যদি কিছু শিখে থাকি, জানলেন দেববাবু, জমিদারি আমল থেকেই—ধনপতিদের আমল থেকে কিছু নয়। তাঁরাও অবশ্যি ভদ্র, অমায়িক, সজ্জন হতে পারেন। পাড়াতেই তো, শুনেছি নাকি, তেমন দু'চার আছেন—এই তো বাঁমাবাবু, তিনি তো ধনপতিদের দলেই, দিব্যি একটা নিষ্কাম এসে গেছে মনে! আপনি তো ত্যাগের ভেতর দিয়েই চলেছেন! আপনার মতো হতে পারলাম কই?

বাঁমাবাবুকে আর যা-ই মনে করুক পিনাকী, নিষ্কাম, ত্যাগী মোটেও মনে করে না। অসুখ-বিসুখে ভগবানের উপর যতোটা পিনাকীর নির্ভর, এবং এঞ্জিনীয়রবাবুও যতোটা তা হয়েছেন—বাঁমাবাবু কি তা-ই। অসুখে ডাক্তার-নার্স সব-কিছু চাই তাঁর! এ না হলে কি ছেলে শাঁড়িখানা খোলে বাড়িতে! তাছাড়া, বাঁশদ্রোণীতে তাঁর প্লট বেরোল কী করে? যাক্ গে—যাক্। নিজের কথাই যে ভাবেনি কোনোদিন—পরের কথা সে ভাবতে যাবে কেন? ভেবেছে—নায়েবমশাই-এর কথা, যাঁর নামে চুরির অভিযোগ ছিল? আর চুরি! কে শিখিয়েছেন ও'দের? বাবা-ঠাকুর্দারাই। নায়েবকে মাইনে তো দিতেন দশ থেকে পনেরো। বলে দিতেন,—আর যা-কিছু করে-কম্মে খাও গে! তার মানে, এক হাত প্রজার ধানে আরেক হাত জমিদারের পাওনা খাজনায়! দু'হাতে লুঠ আর কাকে বলে!

যে যাকে নিয়ে ভাবলেন খানিকক্ষণ জমিদারনন্দন আর জজবাবু। তারপর কাচের গ্লাসে সরবত নিয়ে সোমা ঢুকল এই আত্মনিমগ্নদের ঘরে।

কিন্তু আজ যেন জমিদার-নন্দন পিনাকী মৃত্তপুরুষ, তাই সোমার প্রবেশে বিশুদ্ধ, নিষ্কাম, নন্দনে নন্দিত হয়ে বললে,—বাঃ।

ট্রে-ধরা হাত কাঁপল একটু সোমার অপরিচিতের মুখে এই তারিফের ধ্বনি শুনে।

জজবাবু বুঝতে পারলেন পিনাকীকে। আজ যেন তাঁর মন সবার মনকে ধরতে পারছে। একটি বিন্দু থেকে মস্ত একটা বৃত্তে প্রসারিত। বাদ-ছাঁদ দিয়ে বাঁকা-চোরা এলাকা তৈরী নয়। মোটের উপর সবার মনের শরিক হতে পারছেন তিনি, যেমনি দেববাবুর, সোমার, সোমার স্বামী সুপ্রিয়র, মলয়ার, উপাধ্যায়ের—সবার, শুধু সুব্রতর নয়, মহুয়ার নয়। দেখতে পারছেন মনিকাকে স্বার্থপরতায়, দুর্বলতায় মেয়েটা যে অসম্পতি-পূর্ণ—এখনকার বেশিরভাগ মানুষই যা হয়। তিনি দেখলেন তো আজীবন দৈবতর্জীবনের শরিক কেউ যদি থেকেও থাকে সে সিঁড়ি দিয়ে নামছে—যেন দার্জিলিং-এর জলা পাহাড় থেকে নীচে ওই চ্যালার মতো বিষাক্ত ট্রেনটাতে যেতে হবে। মালে এলো, সঙ্গিনীকে বেছে নিল, নামছে—স্বার্থপর দু'জনই তাই একটু পথ নেমেই দুর্বলতা! তারপর সেই বিষাক্ত

ট্রেনে কলকাতা আসা, সঙ্গতি নেই—তবু এক কামরার যাত্রী! চলতে হবে—কলকাতা পর্যন্ত। যদি ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে দু'জনের কেউ মারা যায়? জজবাবু দেয়ালে তাকালেন। তারপর দরজায় মনিকাকে আশা করে তারপর সোমার মুখে—এখনো কাঞ্চনজঙ্ঘার লাইট-এফেক্ট যেন তিনি খুঁজলেন তিনি সোমার মুখে জলপাহাড়ের বাড়ির জানলা খুলে। ভোরের সোনালি! বিষে নীল হতে কতোক্ষণ?

বললেন,—মা, এই দেববাবু! দেবচরিত্রের মানুষ! তাঁর মুখে তারিফ পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়!

মুখ তুলে রুপোলি হাসি হাসল সোমা—ক'দিন আগেও তার কোমর থেকে যে রুপোলি কল্কাটা ঝুলত—তারই মতো চিক্‌চিকে হাসি ফুটল দাঁতে!

মা বলতে বোধহয় সাধ জাগল পিনাকীরও। বললে,—ওসব তোমার বাবার বাড়িয়ে বলা মা—দেব উপাধি ধরে আছি বলে উনি ভাবেন আমরা সবাই দেবতার বাচ্চা। মোটেই কিন্তু তা নই! গৃহপালিত পশু বলতে পারো! দ্বিজুবাবু ঠিক চিনেছিলেন আমাদের; মানুষ আমরা নাই তো, মেষ।

পংক্তিটাতে অন্য যতি দিয়ে বললে পিনাকী। এবং ট্রে থেকে গ্লাসটা তুলে নিলে।

সোমা হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইল। সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মী উঠে দেব-অসুরের দিকে যেমনি বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়েছিলেন, সে-ছবিটা মনে আনতে পারলে—সোমার দাঁড়ানোর সঙ্গে মেলানো যেতো!

পিনাকীরঞ্জন দেব সুধা না বিষ পান করছিল বোঝা গেল না। অবশ্যি সবই তার পক্ষে সমান—এমনি শিব হয়ে গেছে বা বরাবরই ছিল সে। উলঙ্গ হতেও তার দ্বিধা নেই, শব হতেও না, পাথর হতেও না! সম্প্রতি সে পাথর ছাড়া আর কী? মাধুরী জল ঢালছে! মধুরই তো লাগছে জীবন। কোনোদিন কোনো আশাই সে করেনি—কাজেই সুখী।

লুব্ধতা দেখালেন শশাঙ্কশেখর। যদিচ তিনিও শিব। কিন্তু সতীকে যেন মনে পড়ল। দেয়ালের ছবিতে তাকালেন তিনি আবার। আসুরিক মনটাকে সমাধিস্থ করতে।

বললেন,—সুপু বেরিয়ে গেছে? না বেরোলে বলো তো আসতে।

ঘাড় কাৎ করে আজ্ঞা-পালন করতে গেল সোমা।

পিনাকী এক চুমুকেই বিষামৃত গলাধঃকরণ করে বললে,—সভায় কে কে আসছেন—জানেন তো? এঞ্জিনীয়রবাবু বললেন—অবশ্যি ছেলের মুখ থেকে শোনা খবর,—রণেন মিত্র, হেরম্ব সেনগুপ্ত—চেনেন না কি?

—চিনিনে। কিন্তু নাম পরিচিত। ও'দের বই দেখেছি সোমার কাছে!

—দু'জনই নাকি পশ্চিবিভূষণের শত্রু-পক্ষ।

—তা হোন। জওহরলালের?

—মিত্র নাকি চীনপন্থী—ওকে যে কেন আনা হল! পাড়ায় না জানি ধরপাকড় লেগে যায়!

—হুঁ—ও ছেলেটারই কৌশল! ওর চেহারা দেখেই বুঝেছি! চিন্তিত হলেন জজবাবু।

বিকাশ বা অলক, যারই কৌশল বুঝে থাকুন জজবাবু, কৌশলীদের সম্পর্কে উৎসুক হল না পিনাকী। উঠে দাঁড়াল। তার খবর বলা হয়েছে। রেডিও স্টেশনের বার্তা-পরিবেশকের মতো চুপচাপ হয়ে গেল সে।

—এ কী! বসুন! কাতরোক্তি করলেন শশাঙ্কশেখর। একা থাকতে যেন ভয় পাচ্ছেন —পাছে বিষণ্ণতা এসে তাঁকে গ্রাস করে।

পিনাকী তো জানে না, সে আসবার আগে একা-একা জজবাবু কী পাগলামি করেছেন, কাজেই 'বসুন'-কথায় পূর্ব-পূর্ব সাক্ষাৎকারের 'আসুন-বসুন'-কথার চাইতে ভাব-ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলে না, যাবার মেজাজেই বললে,—নাঃ—যাই এখন! আপনারও তো স্নান-খাওয়ার নিশ্চয় সময় হল।

পিনাকীকে দরজায় দেখে জজবাবু যেমন তার উপস্থিতিটা বুঝে নিতে সময় নিচ্ছিলেন, তাকে দরজা পার হতে দেখেও তেমনি তার অস্তিত্বের অভাবটা বুঝে নিতে দেরি করলেন। কেন যে এমন হচ্ছে তা ভেবে দেখবার বিচারশক্তিও যেন ছিল না তাঁর। ভাবতে পারতেন এটা স্ট্রোকের পূর্বাভাস কি না কিন্তু শরীর সম্পর্কেই তাঁর কোনো চেতনা ছিল না। শুধু ভাবলেন, আবার শশাঙ্কশেখর সামনের শাদা-দেয়ালে ঝোলানো ছবিটাতে রঙের খেলা দেখতে পারেন—দার্জিলিং-এ জলাপাহাড়ের বাড়ির জানালা খুলে কাঞ্চনজঙ্ঘার আকাশে একদিন যেমনি দেখতে পেয়েছিলেন। লাইট-এফেক্ট-এর ফোকাস তো সূর্য ছিল সেখানে। কিন্তু কেমন যেন একটা শব্দ শুনেছিলেন সেদিন। মনে পড়ল। শুধু শব্দটাকে মনে পড়ল। তিনি স্ত্রীর ছবিতে তাকালেন। শব্দটা ওখান থেকে আসতে সুরু করবে কি? না তাঁর চোখ থেকে। আলোর শব্দ। আলো থেকে শব্দ।

কিন্তু এখন বোধহয় শব্দটা ছিল সুব্রতর জুতোর। সে ঘরে এলো। বাইরে শব্দ হল। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করবার শব্দ। তারপর হয়তো নিমগাছে হাওয়ার শব্দের সঙ্গে মেশানো ঘরের ফ্যানের প্রায়-অশ্রুত শব্দ মেশানো একটা কিছু ঘরে-বাইরের শব্দ।

অপিসে বেরোচ্ছে সুব্রত—অপিস-কামরার জ্যোৎস্নায় হায়াসিন্থ-গার্ল, সে প্রজাপতির হালকা পাখায় সেখানে বসতে যাচ্ছে। বীঠোফেনের মুন-লাইট সোনাটা শুনেছে সুব্রত—ছবিটা জানে। জ্যোৎস্নায় ফুলের উপর প্রজাপতি বসল কি শয়তান পেছন থেকে ছায়া ফেলল। সুব্রত সুমিত্রর শিক্ষা পেয়েছে—প্রজাপতির লঘু-ডানার অনুভব তার থাকলেও কোনোদিন হায়াসিন্থ-গার্লকে ছুঁতে যাবে না। প্রুস্ত পড়া আছে তার। তাঁর উপন্যাসের শেষ-পৃষ্ঠায় নায়িকা যা করে, ঔপন্যাসিক সুমিত্র উপাধ্যায়ের স্বকীয় জীবন-উপন্যাসের নায়িকাও তা-ই করল। সালোঁর মেয়েটি কী করল? এ খদ্দেরকে পছন্দ করল না। So she expresses herself on her experience with her former lover —দরজায় আসবার আগে ইংরেজি বুকনিটাই তার জিবে এলো সহজে।

দরজায় দাঁড়িয়েই বললে সুব্রত,—সুপুকে ডাকছিলেন, বাবা? সোমা বলছিল। সে তো কখনই হাওয়া!

—হাওয়া! শশাঙ্কশেখর বুঝতে পারলেন না তার বেশি কী আর বলবেন।

—আপনি উঠে চান-টান করুন। বাবার শুশ্রূষায় চকিত মন দিয়ে গেল সুব্রত অপিসে বেরোবার আগে।

তখনো দুপুর নয় কিন্তু এ ঘরে চট্ করে যেন কোনো আদিভৌতিক ম্যাজিকে রাত্রি হয়ে গেল। রাত্রিটাকে অনুভব করলেন শশাঙ্কশেখর কিন্তু কবি ডানের মতো তার কথা দিতে পারলেন না প্রেমাবসানে ইঙ্গিত এনে বা রবীন্দ্রনাথের ছেলেমানুষি কথায়ও যেতে পারলেন না: দুপুর বেলা রাত হয় না কেন?

দিবা-স্বপ্ন। সে-রাত্রিতে দেবীর মুখোশটা নারীর মুখ থেকে খসে পড়ল। সব

মেয়ের মুখ থেকে। পিশাচী। স্তাঁদাল যেন ঘুরছেন নেপোলিয়াঁর সঙ্গে। গ্যেটের সঙ্গে দেখা—শয়তান নিয়ে যাঁর কারবার ছিল। সব শয়তানী। পিশাচী তারপর।

দেববাবুর ত্যক্ত গ্লাসে তাকালেন শশাঙ্কশেখর, অন্ধকারের জ্যোৎস্নায় তাকালেন: গ্লেসিয়ার—গ্লাস। সন্স প্রজেক্ট। ঝিল যোধপুর পার্ক। জয়পুর-যোধপুর। পদ্মবিভূষণ। লেক। ডাল লেক। ডালচাল। নেফা। শিলং। জল। জলাপাহাড়। কাঞ্চনজঙ্ঘা। নামছে ঘামছে। ট্রেন। যোধপুর। পার্ক। তালগাছ। নিমগাছ। তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে। রবীন্দ্রনাথ। গ্লেসিয়ার। ছেলে-মেয়ে পিলপিল করা। শান্তি। নিকেতন। হাট। লালছায়া। সোমা-সোম—সোমবার। আজ। পদ্মনাভ। প্রজাপতি। শাদা ছায়া। কালো-লাল-শাদা। শাদা-লাল-কালো। শাদা-চিতা-কালো। ছাই। ভস্ম। ছাইভস্ম। শিলং-দার্জিলিং-হিমালয়। কাশ্মীর। লেক। রবীন্দ্র সরোবর। দেবদারু। পাইন। লেক। পদ্মবিভূষণ। পদ্মমধু। পাইনে-প্যাল। আনারস। টলস্টয়। আনা। ডিভোর্স। শয়তানী। ডাল—ডার্লিং—ডার্লিং ডাল লেক। গ্লাস—জল। দেববাবু—দেবদারু—বাঁশদ্রোণী—বাঁশধ্বনি—বাঁশী। কিচ্‌মিচ্—কিসমিস—মিষ্টি—কিস্। বাঁশী। জুতো। ছেলেমেয়ে। মুখোশ। মাস্‌ক্‌স্। মার্ক্স। লাল জওহরলাল। শাদা—গান্ধী—জওহরলাল। কালো—মৃত্যু। লাল-শাদা-কালো। রাত্রি। গরম। ফ্যান। ফ্যান দাও। মন্বন্তর।—সোমা। জল। স্বপ্ন বা চিন্তা। ভেতরের সমস্ত অন্ধকার বাইরে এনে রৌদ্রে শুকোতে দিতেন। হালকা চান্দেরা শাড়ির মতো। জ্যৈষ্ঠের গরম দুপুরে ফ্যানের হাওয়ায় শুকোতে হত। শাড়ি উড়ত। সবুজ-মেটে রং উড়ত। শুভরাত্রি ভাবতেন শশাঙ্কশেখর। শুভ-দৃষ্টি। তাকাতেন তিনি দেয়ালে স্ত্রীর ছবিতে। নিমগাছের কল্কা-পাতার সবুজ কলকাতা থেকে দূরে এসে উড়ত হাওয়ায়। হালকা হতে থাকতেন তিনি। কালোর ভার কমে গিয়ে ধূসর। তারপর শাদা। তবু হালকা, পরিচ্ছন্ন এতেই তিনি হলেন খানিকটা।

সোমাকে ডাকতে ইচ্ছে করল যখন তাঁর একগ্লাস জলের জন্যে, সুপ্রিয় এসে ঘরে ঢুকল।

—আমায় ডেকেছিলেন, বাবা? সুপ্রিয় কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

—তোমায়? আচ্ছন্নতা কাটেনি শশাঙ্কশেখরের কিন্তু কেটে গেল হঠাৎ,—ও, হাঁ— সোমাকে বলেছিলাম তোমাকে ডেকে দিতে!

জীবনের স্মৃতিতে এই ডাকার ঘটনা কোথাও খুঁজে পেল না সুপ্রিয়, বাবার এমন ফর্সা, শুকনো মুখও না। কাচের মতো স্বচ্ছ যেন। বাবার খানিকটা কাছে এগোতে চাইল সুপ্রিয়। পায়ে লেগে দেববাবুর রাখা গ্লাসটা গড়িয়ে গেল মেঝেতে। গড়াল খানিকটা। ভাঙল না। নীচুতে চেয়ে সুপ্রিয় ভাবলে, বাবা বোধহয় আমার হাতে আজ জল খেতে চান।

॥ সমাপ্ত ॥

টি. এস. এলিয়ট : সমালোচক

শিশিরকুমার ঘোষ

এলিয়টের কৃতিত্ব কাব্যে না কাব্যসমালোচনায় বলা শক্ত। এই দুয়ের—অর্থাৎ তাঁর কবি-কীর্তি ও সমালোচনা প্রবন্ধাদির—সম্পর্ক নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। সে যাই হোক সমালোচনার বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহ ও বিচরণ দীর্ঘকালের, কাব্যরচনার আদি ও অন্তে তার একাধিক প্রমাণ। "দ্য সেকরেড উড" গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁকে বলতে শুনি যে তিনি মোটেই অজ্ঞজনের সঙ্গে এবিষয়ে একমত নন যে সৃজনীমূলক প্রতিভা সমালোচনাশক্তির অপেক্ষা উন্নততর অবস্থা। তাঁর এহেন সুভাষিতাবলী তথাকথিত নব্য সমালোচনার মূল সূত্রের কাজ করেছে। এলিয়ট শুধু যুদ্ধোত্তর (১৯১৪-১৮) কবিকুলের অগ্রণী নন, সমালোচকরূপেও তিনি পথপ্রবর্তক বটে, যদিও স্বভাবত তাঁর মন শাশ্বতীর উপাসক বা প্রত্যাশী। এলিয়ট কোনো দিনই বৃহৎ সমালোচনা গ্রন্থ লেখেন নি। তাঁর অধিকাংশ রচনাই আকারে ছোট, কিন্তু তাদের ব্যঞ্জনা ও বিস্তৃতি বিস্ময়কর। এখানে তাঁর সমগ্র সমালোচনা সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, কয়েকটি উদ্ধৃতির সাহায্যে তাঁর বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাধারণ পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো।

'এক সময়ে আমি মনে করতাম,' এলিয়ট বলেছেন, 'যে একমাত্র সেইসব সমালোচকদের লেখাই পাঠযোগ্য যাঁরা শিল্পক্ষেত্রে মহৎ সৃষ্টির অধিকারী।' তত্ত্বটি নূতন নয়, তিনি আবার এভাবে তা উত্থাপন করছেন কেন? এলিয়টের ধারণা এই সব শিল্পী-সমালোচকেরা সমালোচনার কালে কোনো রকম গোপন বা অবদমিত সিসৃক্ষা প্রকাশ বা সন্ধান করবেন না। অর্থাৎ তাঁদের সমালোচনা সমালোচনাই হবে, তার পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধি থাকবে না। কিন্তু প্রশ্ন : ওয়ার্ডওয়ার্থ, কোলরিজ বা শেলী কি শিল্পী-সমালোচক নন? তাঁদের কথা এলিয়ট বিস্মৃত হলেন কি করে? আদতে এলিয়ট এদের পছন্দ করেন না। রোমান্টিক-বিরুপতা এলিয়ট সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। মোটকথা, সৃজনীমূলক, বা আবেগধর্মী, বা 'হুইগ' ('উন্ভট'?) সমালোচনার পক্ষপাতী তিনি একেবারেই নন। কিন্তু আনাতোল ফ্রান্স যিনি সরাসরি বলেছিলেন যে সৎ সমালোচনার অর্থই হোলো একটি মহৎ রচনাকে আশ্রয় করে মানবাত্মার এ্যাডভেঞ্চার, তিনি কি বিদগ্ধ শিল্পীগোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত নন? এলিয়টের মতে হয়তো নন।

এমন নয় যে এ সহজ সত্য এলিয়টের জানা নেই যে 'যেখানে সমালোচক নিজেই আবার শিল্পী সেখানে সন্দেহ করার অবকাশ থাকতে পারে যে তাঁদের বিচারগত তোয়াজ আদতে নিজ নিজ কাব্যরীতির স্বপক্ষাচরণ মাত্র'। তাঁর নিজের সমালোচনাও কি সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে না? কয়েক বছর আগে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি শেষ পর্যন্ত সেকথা স্বীকার করেছেন।

সমালোচনার রূপ ও রীতি যাই হোক না কেন, এলিয়টের মতে সমালোচনা না করে উপায় নেই, 'নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সমালোচনাও অবশ্যম্ভাবী'। 'কাব্য কি?' এই প্রশ্ন তোলার অর্থই হোলো সমালোচনার যাথার্থ্য স্বীকার করা। এবং 'যেহেতু কাব্যরচনায় যথেষ্ট বুদ্ধির প্রয়োজন হয় সেইহেতু তার অনুশীলনেও যে মস্তিষ্ক প্রয়োগ প্রয়োজন একথা

বোঝা সহজ'। উক্তিটি শুনতে হয়তো ভাল, কিন্তু কাব্যরচনার ক্ষেত্রে যে মনন ক্রিয়াশীল এবং কাব্যসমালোচনায় যে মনন অপরিহার্য, তারা কি এক ও অভিন্ন? যাই হোক, এলিয়ট মনে করেন 'বহু শিল্পী অপরের চাইতে উৎকর্ষ লাভ করেছেন সে কেবল তাঁদের বিচার-বুদ্ধির জোরে'। (তাঁর এই শাণিত বচন প্রধানতঃ রোমান্টিক কবিদের প্রতিই নিক্ষিপ্ত।)

কিন্তু সমালোচনার প্রয়োজন কোথায়, কেন, কি কারণে বা কোন অবস্থায়? এ বিষয়ে এলিয়ট একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন : 'তখনই সমালোচনার প্রয়োজন দেখা দেয় যখন কবিতা জনচিত্তের সার্থক প্রকাশ হবার কাজে ব্যর্থ হয়েছে।' অর্থাৎ নূতন কবিতা জন্মের সমকালীন বা প্রাক্কালে দেখা দেবে নূতন কাব্যজিজ্ঞাসা। কথাটি ভেবে দেখবার মত। দুর্ভাগ্যবশতঃ বরাবরের মত এই প্রসঙ্গেও এলিয়ট রোমান্টিক সমালোচনার নজিরকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন এবং এর ফলে তাঁর তাঁর বক্তব্য নিঃসন্দেহে দুর্বল হয়েছে।

"দ্য ইউস অফ পোয়েট্রি এ্যান্ড দ্য উইস অফ ক্রিটিসিজম্" গ্রন্থের উপসংহারে এলিয়ট এই অভিমত জানিয়েছিলেন যে সমালোচনার ব্যাপারে তাঁর কোনো নিজস্ব সূত্র বা মতবাদ নেই। একথা সত্য যে তিনি কোনো ইসথেটিকস্ বা 'প্রিন্সিপলস্ অফ লিটারারি ক্রিটিসিজম্' লেখেন নি। কিন্তু তাঁর যে নিজস্ব বেশ কিছু মতামত, আদর্শ বা বিশ্বাস আছে তা তিনি গোপন করতে চান নি বা পারেন নি। সংক্ষেপে, এলিয়টের সমালোচনার দুটি প্রধান বক্তব্য বা আশ্রয় হোলো : সংহতি এবং ঐতিহ্য। 'ঐতিহ্য' শব্দটি, এলিয়ট ভাল করেই জানেন, অধিকাংশ ইংরাজের কাণে শ্রুতিমধুর ঠেকবে না। ১৯১৯ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত বিবৃতি 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তি-প্রতিভা' (Tradition and the Individual Talent) পড়লে এলিয়টের সমালোচনার মূল সুর বা সূত্রটি বুঝতে দেরী হয় না। 'আমি তখন আলোচনা করছিলাম শিল্পীর ভূমিকা সম্পর্কে এবং, আমার বিবেচনায়, শিল্পীর পক্ষে কি ধরনের ঐতিহ্যবোধের প্রয়োজন; সাধারণভাবে বলতে গেলে সংহতির (order) সমস্যাই প্রধান। আমার মতে সমালোচনার ভূমিকা ঐ একই সমস্যার অন্তর্ভুক্ত।' এর সঙ্গে সহজেই যুক্ত হয়েছে ঐতিহ্যপ্রসঙ্গ, এলিয়টের ভাষায়, সেই 'বৃহত্তর সার্থকতার প্রসঙ্গ'। 'উত্তরাধিকারসূত্রে একে পাওয়া যাবে না (যেহেতু তাঁর ভাগ্যে জোটে নি?)...একে লাভ করতে হলে দস্তুরমত মেহনত করতে হবে।' এই মেহনত করার অন্যতম অর্থ হোলো ঐতিহাসিক বোধ বা দৃষ্টি অর্জন করা, যাকে এলিয়ট বর্ণনা করেছেন অতীতের অতীতত্ব দিয়ে নয়, বরং চলমান বর্তমানেও তার প্রাণপ্রবাহের সাহায্যে : 'কালাতীত ও সাম্প্রতিকবোধ উভয়কে এক করে দেখতে পারা চাই।' এই সমদৃষ্টি বা দেখার দ্বারাই শিল্পী সত্যকারের ঐতিহ্যবোধ অর্জন করেন। আরও স্পষ্ট ভাষায় : 'লেখক কেবল তাঁর নিজের যুগের কথাই লিখবেন না, তাঁর প্রয়োজন এমন একটি ইতিহাসচেতনার যার মধ্যে হোমারের কাল হতে আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য এবং তাঁর স্বদেশের সাহিত্য সহ-অবস্থিত, এবং এই সমগ্রের সমাহার বহন করছে একটি বিশেষ সংগতি।' এর থেকে এলিয়ট যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা এই যে 'কোনো কবি বা শিল্পী তাঁর সম্পূর্ণ সার্থকতা একক বা নিঃসঙ্গভাবে পেতে পারেন না'।

প্রথম দিকে এলিয়টের মনোজগৎ বা সাহিত্যদর্শনে ঐতিহ্যচেতনা মূলতঃ সাহিত্যধর্মী ও ইউরোপীয়। উভয়ের উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে তিনি বারবার দান্তের উল্লেখ করেছেন, দান্তে যাঁর সংস্কৃতি 'সমগ্র ইউরোপের প্রতিভূ', কোনো দেশবিশেষের নয়। পরে ধর্মাশ্রিত আলোচনার পথে পা বাড়ানোর কালেও দান্তের উদাহরণ এলিয়টকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

লক্ষ্য করার বিষয়, মধ্যযুগীয় মানসের ইংরেজ কবি চসার সম্পর্কে এলিয়ট বলতে গেলে নীরব।

স্বভাবের উজান বেয়ে এলিয়টের পরবর্তী সাহিত্য সমালোচনা ক্রমশঃ তাত্ত্বিক ও ধর্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠলো। দেখা দিলো এক ধরনের মতুয়া মনোভাব। যেমন সেই স্মরণীয় ও কিছুটা কণ্টকিত আত্মপরিচয় : রাজনীতির ক্ষেত্রে আমি রক্ষণশীল (এলিয়ট সরাসরি 'royalist' কথাটি ব্যবহার করেছেন), সাহিত্য ব্যাপারে ধ্রুপদী এবং ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে এ্যাংলো-ক্যাথলিক। এলিয়ট আরো বলেছেন : 'আমি স্বভাবতই বিশ্বাস করি যে আমাদের পক্ষে সত্যিকারের ঐতিহ্যবোধের অর্থ : তাকে খৃস্টীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম ও অনুগামী হতেই হবে।' (এলিয়ট কি তাহলে মধ্যযুগীয় সনাতনী? 'প্রগতি'-তে তাঁর সত্যিই কোনো আস্থা নেই। খৃস্টানমাত্রেরই নেই, থাকতে পারে না।) পরবর্তীকালে, "এসেজ, এনসেন্ট এ্যান্ড মডার্ন" বইটিতে 'ধর্ম ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে কোনো প্রকার দ্বিধা না করে তিনি ঘোষণা করেছেন যে সাহিত্যবিচার 'সর্বকালে কোনো না কোনো নৈতিক আদর্শের দ্বারা চালিত হয়েছে এবং হবেও'। 'সাহিত্যরসিক হিসাবে আমাদের জানা দরকার কি আমাদের পড়তে ভাল লাগে। কিন্তু খৃস্টান এবং সাহিত্যরসিক হিসাবে কি আমাদের ভালো লাগা উচিত তাও জানা দরকার।' পরে মতবাদ আরো অকুণ্ঠিত : 'আমি এ-প্রসঙ্গে যা-কিছু বলবো তা কেবল এই সাধারণ বক্তব্যের সমর্থন মাত্র, তা হোলো এই যে নিঃসংশয় এবং তাত্ত্বিক বিচারই সাহিত্য সমালোচনাকে সম্পূর্ণতা দিতে সক্ষম।' তাই "প্রিন্সিপলস্ অফ লিটারারি ক্রিটিসিজম্"-প্রণেতা, আই. এ. রিচার্ডসন যখন, নিজ মতামতের স্বপক্ষে, "দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড"-এর এই বলে প্রশংসা করেন যে 'কাব্য ও সর্বপ্রকারের প্রত্যয়ের দায় হতে মুক্ত' এই অভূতপূর্ব কাব্যগ্রন্থ, সে খবরে এলিয়ট—ততদিনে তাঁর ধর্মান্তর ঘটেছে—যে প্রীত হন নি তার কারণ বোঝা কঠিন নয়। ধর্মনিষ্ঠ সমালোচকের পক্ষে অ-ধর্মী কবি আখ্যা মেনে নেওয়া চলে কি করে? তাছাড়া এলিয়ট ইতিমধ্যে খৃস্টীয় সমাজ ও সভ্যতার,[১] ক্যাথলিক ধর্ম ও আন্তর্জাতিক ঐক্যের দিকে পা বাড়িয়েছেন। এখন তাই শোনা যাবে : 'ঐতিহ্যবিষয়ক সমস্যাটি স্বভাবতই আমার কাছে আগের মত আর অত সরল ঠেকে না, তার বিশুদ্ধ সাহিত্যিক বিচার বা সমাধান করাও আমার পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়।'

তবে এলিয়ট ধর্মান্ধ সমালোচক নন। তাঁর সম্পাদনায় *Criterion* ত্রৈমাসিক পত্রিকা দীর্ঘকাল ইউরোপ-আমেরিকার নানা মতাবলম্বীদের খোলা ময়দান ছিল।। অন্যান্য বহুস্তর প্রসঙ্গ ও সাহিত্যাতিরিক্ত প্রবণতা সত্ত্বেও এলিয়ট একাধিক উজ্জ্বল সাহিত্য-চিন্তামণি, বিশ্লেষণ ও ইঙ্গিত রেখে গিয়েছেন। বহু রীতি ও খ্যাতির হেরফের ঘটিয়েছেন এই একক ও নিষ্ঠাবান সাহিত্যবিচারক। আধুনিক কালে কাব্যনাট্যের পুনরুজ্জীবন, জেকোবীয়ন বা শেইকসপীয়ার-পরবর্তী নাটকের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে মেটাফিজিকল কাব্যকলার প্রবল প্রাদুর্ভাব—"শেষের কবিতা"-র অমিট্ রে বাঙালী-বাঙালী অনুবাদ সমেত ডান্ থেকে উদ্ধৃত করেছে—ড্রাইডেনের প্রতি অর্ঘ নিবেদন, মিলটনকে তাঁর উচ্চাসন থেকে স্থানচ্যুত করা, অধিকাংশ রোমান্টিক কবিদের নস্যাৎ করা—এ সমস্তের মূলে আছেন টি. এস. এলিয়ট ও তাঁর গুটিকয়েক শাণিত প্রবচন।

এলিয়ট-সমালোচনার অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে রোমান্টিকবিরোধিতা। তাঁর নব্য-ধ্রুপদী দৃষ্টিকোণ থেকে রোমান্টিক কবিকুলকে মনে হয়েছে উন্মার্গগামী বিদ্রোহী,

[১] The Idea of a Christian Society : *Notes Towards the Definition of Culture.*

অপরিণতমনস্কের দল। গ্যয়টের—যদিও গ্যয়টের সম্পর্কে এলিয়টের শ্রদ্ধা মোটেই অবিমিশ্র নয়—উক্তির প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেছেন : 'জীবনের ক্ষেত্রে রোমান্টিকতার স্বপক্ষে বলার হয়তো অনেক কিছুই আছে, কিন্তু সাহিত্যে সে অপাঙক্তেয়।' এই রোম্যান্টিক উৎপাতকে তিনি যেন কিছুতেই ভুলতে বা বরদাস্ত করতে পারেন না—তাই সুযোগ পেলেই ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের প্রতি শ্লেষ করেছেন, শেলীকে 'cad' বলার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ড্রাইডেন-প্রশস্তি গাইবার কালে তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'কিন্তু যেখানে ড্রাইডেন আমাদের তৃপ্তিসাধনে অক্ষম, উনবিংশ শতাব্দীও তো তথৈবচ; এবং যেখানে উনবিংশ শতাব্দী ড্রাইডেনকে নিন্দাবাদ করেছে, সে-নিন্দা তার নিজেরও প্রাপ্য।' ব্লেক প্রসঙ্গে ঐতিহ্যবাদী এলিয়টের এই কথাই মনে হয়েছে যে প্রাণবান ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত না হতে পারা প্রতিভাবান শিল্পীর পক্ষে কি ভয়ানক বিপদজনক ও দুঃখের কথা।

সব কিছুকে ছাপিয়ে আছে মেটাফিজিকল্ কাব্যরীতির স্বপক্ষে তাঁর সূক্ষ্ম, স্বল্প ও সতেজ ব্যাখ্যা ও বিবৃতি। অধ্যাপক গ্রীয়র্সনের সংকলনের এই সংক্ষিপ্ত রিভিউ আধুনিক ইংরেজি কাব্যে এক অভিনব দিগ্‌নির্দেশ। এলিয়টের ভাষায়, '(কাব্যরীতির) এই পার্থক্য যে বিভিন্ন কবিদের মধ্যে অল্পবিস্তর রকমফেরের মধ্যে আবদ্ধ তা নয়। এ হোলো এমন একটা কিছু যা ডান্ বা লর্ড হার্বার্ট এবং টেনিসন ও ব্রাউনিঙের যুগের মধ্যে ইংল্যান্ডের মানসলোকে ঘটেছে, এই পরিবর্তন হোলো বুদ্ধিজীবী ও ভাবপ্রবণ কবিদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য। টেনিসন ও ব্রাউনিঙ উভয়েই কবি, এবং তাঁরা মননক্ষমও বটে; কিন্তু যেভাবে গোলাপের সুগন্ধ অনুভব করা যায় তাঁদের মননে অনুভূতির সে স্পর্শ নেই। ডান্-এর কবিতায় মনন এক রকমের অভিজ্ঞতা, যা তাঁর অনুভবের এক সামগ্রিক পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম। কবিমানস যখন সৃজনকর্মের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, সে তখন নিয়তই বিপরীত অনুভবের একীকরণে সক্ষম; সে তুলনায় সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা খণ্ডিত, বিসদৃশ এবং সম্পর্করহিত। সে মানুষ ভালোবাসে অথবা স্পিনোজা পড়ে, এই দুইয়ের মধ্যে—বা টাইপরাইটারের শব্দ বা রান্নার গন্ধ—কোনো যোগাযোগ নেই, কিন্তু উপযুক্ত কবিমানসে এ সমস্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সর্বদাই এক নূতন সম্পূর্ণতা লাভ করে চলেছে।'

প্রসঙ্গতঃ আধুনিক কাব্যের দুর্বোধ্যতা এবং কাব্যকলায় নৈর্ব্যক্তিকতার মূল্য নিরূপণ করার ব্যাপারে এলিয়টের বিভিন্ন নির্দেশ সুবিদিত। তাঁর অনেক পূর্বজের—যথা টি. ই. হিউম, আর্ভিং ব্যাবিট, এজরা পাউন্ড, রেমি দ্য গুরমঁ, ও পল ভ্যালেরি—প্রতিধ্বনি শোনা যাবে এই সমস্ত সূত্রে ও তাদের শাস্ত্রীয় আলোচনায়। কাব্যে নৈর্ব্যক্তিকতার মূল্য ও হেতু সম্পর্কে এলিয়টের বিচার প্রাজ্ঞোচিত। এবিষয়ে তাঁর মতামত সহজেই মনে দাগ কাটে, যদিও এলিয়ট সম্পূর্ণ বিস্মৃত, বা জানতে চাইবেন না সে-কথা, যে রোমান্টিক কবিরাও স্বধর্মানুযায়ী এক ধরনের নিশেষ নৈর্ব্যক্তিকতা, সাধারণীকৃতি দাবী করতে পারেন।

এই বিষয়ে এলিয়টের কয়েকটি স্মরণীয় উক্তি উদ্ধৃত করা হোলো—

'শিল্পীর প্রগতির অর্থ হোলো নিত্য আত্মাহুতি, ব্যক্তিসত্তার বিলোপ।'

'শিল্পী যতই বিশুদ্ধ ও পরিণত হবেন, ততই তাঁর মধ্যে অনুভবে পীড়িত মানুষ এবং যে-মন সৃষ্টি করে এদের মধ্যে বিভেদ দেখা যাবে।'

'কবিতার অর্থ নয় ভাবালুতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া, তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়াই কাব্যের উদ্দেশ্য; কবিতা নয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, এবং অহংবোধ হতে মুক্তিই তার

কাম্য। অবশ্য যাঁরা অনুভবক্ষম এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এসবের হাত থেকে রক্ষা পাবার সঠিক অর্থ শুধু তাঁরাই জানেন।'

এলিয়টের এ-অভিমত যদি সত্য হয় যে 'অন্যান্য কাজের মধ্যে মহৎ সমালোচক যে কেবল একটি বিলুপ্ত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ঘটিয়ে থাকেন তাই নয়, বরং ঐতিহ্যের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলির যথাসাধ্য সংগতিসাধনেও যথেষ্ট সচেষ্ট হবেন,' তাহলে এলিয়টের স্থান নিঃসন্দেহে সেই ব্রাহ্মণকুলে। আর একথাও যদি সত্য হয় যে 'কাব্য-সমালোচক কবিতার সমালোচনা করে থাকেন কাব্যসৃষ্টির উপায় হিসাবে' তাহলেও সে কার্যে এলিয়টের অনুরূপ যোগ্যতা ও সফলতা ক'জন আধুনিক কবি-সমালোচকের ক্ষেত্রে সত্য হয়েছে? অবশ্য তাঁর বহুতর বিরাগ ও অসংগতির কথাও একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। ঐতিহ্যের সন্ধানে তাঁকে একাধিক বিচিত্র দেবদেউলে অর্ঘ্য নিবেদন করতে হয়েছে: দান্তে, ডান্ ও ড্রাইডেন—বিচিত্র সে ত্রিমূর্তি বা ত্রিশরণ।

কিন্তু শ্রদ্ধানিবেদন ও কৃতজ্ঞতা মতৈক্যের অপেক্ষা করে না। কৈশোরে তাঁর সংগে প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, *Criterion* পত্রিকায় তাঁর শেষ, বাঁধাবান অথচ সকরুণ সম্পাদকীয়। তারপর বহু বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, এলিয়টের রচনার হেরফের ঘটেছে, বিমুগ্ধতার ঘোর কাটিয়ে আমরাও তাঁর নূতন নিরিখ করতে শিখেছি। কিন্তু 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তিপ্রতিভা'-র এই আশ্চর্য নিদর্শন বিস্মৃত হবার নয়। "দা ইউস অফ পোয়েট্রি অ্যান্ড দ্য ইউস অফ ক্রিটিসিজম্"-এ এলিয়ট জানিয়েছিলেন সে 'গত তিনশ' বছর ধরে সমালোচনা সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্যের বহু অদলবদল ঘটেছে, এবং ভবিষ্যতেও এ পালাবদলের দায় থেকে রক্ষা নেই।' এবং যেহেতু আমাদের অর্বাচীন ও শতধাবিভক্ত সমাজে কোনো সাধুসম্মত বিচার বা সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা নেই, *lingua communis*, 'যাদেরই সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা আছে নিজেদের দৃষ্টিভংগী প্রকাশ করে যাওয়া ছাড়া তাদের আর করণীয় কিছু নেই।' প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবত এলিয়ট সেই কাজ করছেন। এবং তার অতিরিক্ত আরো অনেক কিছু। সাহিত্যে, শিল্পে ও জীবনে সর্বপ্রকারের অসারতা, মোহাচ্ছন্নতাকে তিনি সবলে ও সর্বপ্রকারে উপেক্ষা করেছেন, তিনি চেয়েছেন জীবনের ও শিল্পবোধের উজ্জীবন, অতীতের সংগে যুক্ত হয়ে, বিমুক্ত হয়ে নয়। আগামী যুগে সাহিত্যের নব রূপায়ণ ঘটতে বাধ্য, তত্রাচ এলিয়টের সাহিত্যকৃতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশংকিত হবার হেতু বা প্রয়োজন নেই। তাঁর স্থান প্রথম শ্রেণীতেই থাকবে।

লাজুক অথচ উদ্যাসিক, তাঁর আকস্মিক নম্রতাও কম আশ্চর্যের নয়। দীর্ঘকাল আগে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'অন্যের জন্য আপনারা যে অনুকম্পা দেখাবেন, নিজের জন্যও আমি তারই প্রত্যাশী।' পথিকৃৎ, এই বিদগ্ধ অগ্রজ অবশ্যই সে-দাবী করতে পারেন। অনুকম্পার অতিরিক্ত তিনি, নমস্য।

শোভাযাত্রা

সুশীল রায়

তাকে সৎ বললে তার সব পরিচয় দেওয়া হল না, তাকে বলতে হবে অনেস্ট, তাহলেই তার চরিত্রের কিছুটা পরিচয় হয়তো পাওয়া যাবে।

সত্যি, খুবই অনেস্ট মানুষ এই পরেশ পুরকায়স্থ।

পরেশ নিজেই বলে, 'অনেস্ট ইজ দি বেস্ট পলিসি। এটা যদি সবচেয়ে সেরা পলিসি তাহলে পলিসি হিসেবে অন্তত অনেস্টি অনুসরণ করে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

পরেশ বুদ্ধিমানও। সুতরাং অনেস্টি সে অনুসরণ করে চলেছে রীতিমত মনোযোগ দিয়েই।

তার মনে জোর আছে, সেইজন্যে হাজার রকমের বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে বেশ সচ্ছন্দে চলে যাচ্ছে তার জীবন। কোনো বাধাকেই সে বাধা বলে মানে না, বিপত্তিতেও বিপন্ন হতে সে রাজি না।

সে বলে, 'বুদ্ধি যদি থাকে তাহলেই সব ব্যাপারে ব্যুৎপত্তি অনায়াসেই এসে যাবে।'

বুদ্ধিটা হচ্ছে তার মূলধন, আর অনেস্টিটা হচ্ছে তার পলিসি।

বেশ কৃতী পুরুষ হয়ে উঠেছে পরেশ পুরকায়স্থ বেশ অল্প সময়ের মধ্যেই।

কিন্তু যারা তাকে ভালো করে চেনে তারা পরেশের এই কৃতিত্বে অবাক হয়ে যায়। তাদের অবাক হওয়া দেখে পরেশ হাসে। সে বুঝতে পারে ওরা পরেশকে চিনে ফেলেছে।

যারা তাকে চিনে ফেলেছে তাদের ঘাঁটায় না পরেশ পুরকায়স্থ, তাদের সংগে বেশি করে ভাব করে, তাদের সংগে হাসাহাসি করে, তাদের সংগে গলাগলি করে, কোনো একটা অছিলা নিয়ে তাদের খুব সুখ্যাতি করে, তাদের খুব খাতির করে।

এতে কাজ হয়। উপকারই হয়। যারা তাকে চিনে ফেলেছিল তারা মনে করে তারা নিশ্চয় ভুল চিনেছিল তাকে, আসলে পরেশ হচ্ছে একটা ইয়ে—

পরেশ বিশেষ-কিছু একটা মানুষ না, একজন অতি সাধারণ মানুষ। কিন্তু তার চলন-বলনের কায়দা দেখে, নাক উঁচু করে চলার ভঙ্গি দেখে সকলে একটু তাচ্ছিল্যের সংগেই তাকে বলত, 'উঃ, ও একটা জিনিস।'

কিন্তু এমনই ব্যাপার যে, যাকে একদিন সকলে বলত জিনিস, এখন তাকেই বলছে অন্য কথা, বলছে—জিনিয়স।

এখন কেউ আর ইয়ে বলে লাগসই কথা খোঁজে না।

এখন সকলেই একবাক্যে বলে, 'পরেশ পুরকায়স্থ একটা জিনিয়স।'

জিনিয়স জিনিসটা অনেকটা চুম্বকের মত। আশপাশের জিনিসকে সে কাছে টানে।

পরেশ যখন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জিনিয়স বলে প্রতিপন্ন হয়ে গেল তখন বন্ধুবান্ধবরাই ঘিরে ধরতে লাগল তাকে। এতে মজাটা হল এই যে, পরেশ নিজেকে সত্যিসত্যিই মস্ত বড় বলে মনে করতে লাগল।

কিন্তু কি জন্যে সে বড়, এমন কি-কি কাজ সে করেছে ইত্যাদি প্রশ্ন নিজেকেই সে করে যখন নিজের কাছেই উত্তর দিতে পারে নি, যখন নিজের কাছেই হেরে গিয়েছে, তখনই

সে জোর করে আরও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজের সামনে।

এই ভাবে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে সে নিজের কাছেই দিব্য একটা প্রকাণ্ড পুরুষ হয়ে উঠল।

তখন তার চলন-বলন আদব-কায়দা সবই যেন কেমন হয়ে গেল, আশপাশের সমস্ত মানুষকে সে রীতিমত ছোট বলে মনে করতে লাগল।

যারা পরেশের কাছে ছোট হয়ে গেল তারাও বিশ্বাস করে ফেলল যে, সত্যিই তারা ছোট, অমন বৃহৎ মানুষটির তুলনায় তারা সত্যিই নিতান্ত তুচ্ছ।

যারা ছোট হয়ে গেল তারা স্তাবক হয়ে দাঁড়াল পরেশ পুরকায়স্থর। এক কালে যারা ছিল সমান, যারা ছিল বন্ধু—তারা-সব অসমান হয়ে গেল, তারা হয়ে গেল অর্বাচীন।

পরেশ মনে-মনে হাসে এই ব্যাপার দেখে। বুদ্ধিমান মানুষ সে। নিজেকে সে চেনে ভালোমতই। তাই সে হাসে এই ব্যাপার দেখে।

আজ পরেশ সত্যিই একজন মস্ত মানুষ। আজ তার মেলামেশা কেবল মস্ত মানুষদের সঙ্গেই। অনেক উঁচুতে আজ উঠে গিয়েছে পরেশ পুরকায়স্থ। কিন্তু তার পুরোপুরি ওঠা হয়তো এখনো বাকি আছে।

হেমেন অম্বর ত্রৈলোক্য মনোহর ইত্যাদি তার বন্ধুরা এখন অনেক নীচে পড়ে আছে। পরেশ চলে গিয়েছে তাদের নাগালের অনেক দূরে। এখন, এত দূর থেকে পরেশকে স্পষ্ট আর দেখাই যায় না।

ঝাপসা হয়ে গিয়েছে আজ পরেশ সকলের চোখে।

কিন্তু, আজ এত দিন পরেও, কুড়ি বছরেরও বেশিই বুঝি হবে, এই দীর্ঘ দিন পরেও একজনের চোখে ঝাপসা হয়ে যায় নি পরেশ পুরকায়স্থ।

সে হচ্ছে শোভারাণী রায়। শোভারাণী এখন আর রায় নেই অবশ্য, এখন সে মুখোপাধ্যায়।

তাদের বাল্যকালের জীবনের কথা এখনও মনে পড়ে শোভারাণীর। তাদের সেই শান্তিপুরের জীবনের কথা। একই পাড়াতে থাকত তারা, পাড়ার নাম বেজপল্লী। ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠেছে তখন শোভারাণী, পরেশ তখন পড়ছে কলকাতার কলেজে।

কলকাতা থেকে যখন পরেশ ফিরত তখন তার চটকই আলাদা। ভঙ্গিটা তখন থেকেই বেশ রস্ত করেছে পরেশ। বাবুয়ানিও তার ছিল না, ছিমছামত্বও ছিল না। একটু এলো-মেলো আর উদাসীন ভাব নিয়ে বেজপল্লীতে ফিরে আসত কলকাতার পরেশ।

শোভারাণীর শরীরে শোভা ছিল। সে শোভায় পরেশও একটু কাবু হয়েছিল। কিন্তু তার উদাসীন ভঙ্গি দিয়ে সে শোভারাণীকে আরও বেশি কাবু করে তুলেছিল।

সেসব কথা এখন বাসী। কিন্তু বাসী হলে হবে কি, ভালোবাসাবাসি জিনিসটা কখনো ভেসে চলে যায় না সময়ের স্রোতেও। স্রোতেরও যেমন একটা টান আছে, এ জিনিসটারও টান থাকে তেমনিই। কিন্তু পুরনো ইস্পাতে যেমন জং ধরে, পুরনো ইচ্ছারও তেমনি রং বদলায়।

খুব নাম করেছে এখন পরেশ পুরকায়স্থ। কাগজে-কাগজে ছাপা হয় তার নাম। কোথায় ভাষা-আন্দোলন, সেখানে বক্তা পরেশ; কোথায় নগরসংকীর্তন, তার পুরোভাগে পরেশ পুরকায়স্থ; কোথায় গানের জলসা, তার শুভ-উদ্বোধনে—

শোভারাণীর মনে পড়ে তার অতীত জীবনের কথা। এখন কত উঁচুতে এই পরেশ, এখন কত দূরে সেই পরেশ, কিন্তু একদিন ছিল যখন—

খবরের কাগজ খুলে শোভারাণী তার স্বামীকে বলে, 'দেখ, দেখ, দেখ! কত বড় হয়ে গেছে মানুষটা। একদিন যে আমরা পাশাপাশি কাছাকাছি থাকতাম, তা বিশ্বাস করাই যায় না। কিন্তু বিশ্বাস করতে ভীষণ ভালো লাগে।'

অধ্যাপক অনঙ্গমোহন মুখোপাধ্যায় চন্দননগরের একজন বিশিষ্ট নাগরিক। খুব বিজ্ঞ মানুষ এবং বেশ পণ্ডিত লোক। তাঁর আর্থিক অবস্থাও তাঁর পাণ্ডিত্যের মতই সচ্ছল। পুত্ররাও বেশ বড় হয়ে উঠেছে, একজন এখনো স্কুলে পড়ছে, একজন ঢুকেছে কলেজে। তারা বাপের স্বাস্থ্য পেয়েছে, এবং পেয়েছে মায়ের রূপ। ছেলে-দুটিই বেশ সুপুরুষ।

শোভারাণীর সংসার বেশ সুখের সংসার। চন্দননগরের অনেকেই এই শোভন সংসারটির কথা নিয়ে গল্পগুজব করে আনন্দ পায়।

শোভারাণী আবার বলল, 'খুব উন্নতি করেছে বটে!'

অনঙ্গমোহন বললেন, 'নিশ্চয়। খুব নাম করেছেন। প্রায়ই কাগজে নাম দেখি।'

'হ্যাঁ। খুব নাম করেছে।' খুশিতে প্রাণ ভরে গেল শোভারাণীর, বলল, 'কিন্তু খুব লাজুক ছিল, খুব পাগলাটে ছিল ছেলেবেলায়।'

বইটা বন্ধ করে রাখতে-রাখতে অনঙ্গমোহন বললেন, 'ঠিকই তো। ওরাই তো জীবনে বড় হয়। বড় হবে বলেই তো ওরা পাগলাটে হয়, বড় হবে বলেই তো ওরা লাজুক হয়।'

সেই অতীতদিনের কথা ভাবতে গিয়ে শোভারাণীর মনে পড়ে গেল আর-একটা কথা। আর-একটা মানুষের কথা। উঃ, কী চাল ছিল তার, কী চটকই তার ছিল। আবার, বামন হয়ে তার ইচ্ছে হয়েছিল চাঁদে হাত দেবার। সে কথা ভেবে হাসি পায় শোভারাণীর।

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে বসে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন অনঙ্গমোহন, স্ত্রীর মুখের দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই বললেন, 'ও কি, পাগল হলে নাকি? একা-একাই হাসছ যে! আমাকে কি কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে?'

হেসে উঠল শোভারাণী, বলল, 'কথার কি রকম ছিরিই হচ্ছে! একটা কথা মনে পড়ায় হাসি পাচ্ছিল।'

কি কথা মনে পড়ায় তার অমন হাসি পেল, সে কথাটা বলার আর ইচ্ছে হল না শোভারাণীর। এই বয়সে এখন আর ওসব কথা নিয়ে আলোচনা করা শোভা পায় না।

কিন্তু লোকটার নাম আজও মনে আছে শোভারাণীর। তার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ। ভারি পাজি ছিল ছোকরাটা। বাংলা জানত না, তবু বাংলা বলত। উ, কি ছিরিরই সে উচ্চারণ, বলত—সুবারাণী। প্রাণে তার খুব শখ, প্রেম করতে চেয়েছিল সে শোভারাণীর সঙ্গে। খুব জ্বালিয়েছিল তাকে ঐ ছেলেটা।

তার বাবা করত তেজারতির কারবার। শান্তিপুরের বাজারে ছিল তার গদি। তারা বাসা নিয়েছিল পরেশদের বাড়ি থেকে একটু দূরে। ছেলেটা নাকি থাকত পাটনায়। বাংলা-দেশে এসেই সে এসে উপস্থিত হল শান্তিপুরে। উ, সে কী অশান্তি।

পরেশের সঙ্গে কৃষ্ণপ্রসাদের ছিল খুব ভাব। দুজনে প্রায় হরিহরাত্মা হয়ে উঠেছিল। তাদের এই অন্তরঙ্গতা দেখে অন্তরাত্মা আরও জ্বলে যেত শোভারাণীর।

কিন্তু সেসব গল্প আজ অনঙ্গমোহনের সঙ্গে করে লাভ কি। শোভারাণী তাই তার হাসি বন্ধ করে মুখ বন্ধ করে বসে রইল।

'কি, হল কি! অমন গম্ভীর হয়ে গেলে যে?'

অনঙ্গমোহনের এই কথা শুনে শোভারাণীর অঙ্গ যেন জ্বলে গেল, বলল, 'হাসলেও

অপরাধ নেবে, গম্ভীর হলেও কৈফিয়ত চাইবে। তোমার হল কি?'

নির্বিরোধ মানুষ অনঙ্গমোহন, বললেন, 'থাক্। ঠিক আছে।'

চন্দননগরের মুখোপাধ্যায়-পরিবারের জীবন কেটে চলেছে এইভাবে। এখানে বিরোধ নেই, বিদ্বেষ নেই, বিষাদ নেই, বিস্বাদ নেই।

অদূরে গঙ্গায় জোয়ার-ভাটা খেলে, কিন্তু এখানে জোয়ার-ভাটাও বুঝি নেই। এখানকার জীবন নীরব ও নম্র, এখানকার জীবন স্বচ্ছ হ্রদের মত।

কিন্তু সেই স্বচ্ছ হ্রদে হঠাৎ ঢোল পড়ে গেল একদিন সন্ধ্যায়। হঠাৎ এসে উপস্থিত হল এখানে সেই মস্ত মানুষটি—বুদ্ধিই যার মূলধন, অনেস্টিই যার পলিসি।

বাগান পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠতে উঠতে পরেশ পুরকায়স্থ বলল, 'আমি পরেশ। কি, চিনতে পারেন?'

শোভারাণী বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দায় সুইচ টিপে দিয়েই বলল, 'বিলক্ষণ। বিলক্ষণ। চিনব না কেন? কিন্তু চমকে গেলাম যে, আপনার মত মানুষ, হঠাৎ এখানে ইয়ে—পদধূলি?'

বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়ে পরেশ বলল, 'ধূলি এককণাও নেই এ পায়ে। ঝুলি ঝাড়লেও ধূলি পড়বে না, এমনি রিক্ত—'

কথায় বাধা দিয়ে শোভারাণী বলল, 'আসুন। ভিতরে আসুন।'

শোভারাণীর দু পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল তার দুই ছেলে। তাদের দিকে চেয়ে পরেশ বলল, 'এদের দেখেই চিনলাম কিন্তু। পরিচয় দিতে হবে না। গ্র্যান্ড ছেলে দুটি আপনার, গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড।'

ঘরের ভিতরে এসে আলাপ হল অনঙ্গমোহনের সঙ্গে। অনঙ্গমোহনের বুদ্ধি পরেশের মত প্রখর নয়, তাই তিনি সহজেই পরেশের অমায়িকতায় ও বিনয়ে বিগলিত হয়ে গেলেন। বললেন, 'আপনি সত্যিই বড়, এতবড় মানুষ আপনি, কিন্তু কত সহজে আমাদের সঙ্গে—'

বাধা দিয়ে উঠল পরেশ পুরকায়স্থ, বলল, 'উহুঁ, উহুঁ, উঁহুঁ! অত সহজ নয়, যত সহজ ভাবছেন তত সহজে নয়। রীতিমত শক্ত কাজ করেছি। খুঁজে বার করেছি আপনাদের। আজ কত বছর হয়ে গেল, যার খোঁজ রাখিনি এতদিন, হঠাৎ তাকে খুঁজে বের করা কি সহজ কথা। বলুন আপনি। আপনি জ্ঞানী লোক, গুণী লোক, আপনি পণ্ডিত লোক, আপনি বিজ্ঞ লোক, বলুন আপনি।'

কথা বুঝি জড়িয়ে গেল অনঙ্গমোহনের, তিনি কথা বলতে পারলেন না। এতবড় একজন মানুষের মুখে তাঁর এতটা সুখ্যাতি শুনে তিনি অভিভূত হয়ে গিয়েছেন। মানুষটা যে সত্যিই একজন মহৎ মানুষ, এ বিষয়ে তাঁর বিন্দুবিসর্গ আর সন্দেহ নেই।

স্ত্রীর মুখে তিনি শুনেছেন এই মানুষটার কথা। মানুষটা সম্বন্ধে তিনি যেন সবই জানেন। কিন্তু তাঁর জানার কৌতূহল হল, এত বড় যে ইনি হয়েছেন, কি কাজ করে এত বড় হলেন? কোনো কাগজে কখনো সে কথা খোলসা করে লেখা হয়েছে বলে তাঁর মনে হয় না। মানুষটাকে এত কাছে পেয়ে তাঁর জানতে বড় ইচ্ছে হল কথাটা। কিন্তু সে কথা তো জিজ্ঞাসা করা যায় না।

পরেশ একটা জিনিয়স। জিনিয়স জিনিসটা অনেকটা চুম্বকের মত। ঠিক। তাই। শোভারাণী তো আকৃষ্ট হয়ে আছেই, অনঙ্গমোহনও লোকটার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলেন।

যত কথা বলছেন, লোকটাকে ততই অপূর্ব লাগছে, ততই অদ্ভুত ঠেকছে, ততই ইন্টেলিজেন্ট ও ততই অনেস্ট বলে ধরতে পারছেন।

অনেকক্ষণ ধরে গল্পগুজব হল তাঁদের। অনেক অবান্তর কথা, অনেক অন্তরঙ্গ কথা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরেশ এঁদের একেবারে আপনার জন হয়ে গেল।

পরেশ বলল, 'বেশ। ভালোই। যোগাযোগ যখন হয়ে গেল ঈশ্বরের ইচ্ছায়, তখন, কাল আসুন একবার কলকাতায়—মিউজিয়মে একটা এগজিবিশন আছে, বিরাট স্কেলে করা হচ্ছে এই ইন্টারন্যাশনাল এগজিবিশন, কলকাতায় এই প্রথম। বিরাট বিরাট গণ্যমান্য লোক আসছেন দেশবিদেশ থেকে। আপনারাও আসুন। বলেন তো গাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারব, কলকাতা থেকে চন্দননগর আর কতটুকুই বা রাস্তা, এক ঘণ্টায় এসে যাবে। আরও বলেন তো' একটু হেসে পরেশ বলল, 'আমি এসেও নিয়ে যেতে পারি।'

এদের যেন চমকে দিতে লাগল, প্রায় পাগল করে তুলতে লাগল এই বিরাট মানুষটি। এত বড় একজন মানুষ কত ছোট হয়ে কত কাছের হয়ে এমন প্রস্তাব করে বসছে, শুনে অবাকই হয়ে যেতে হয়।

দর-কষাকষি ও বিনয়ের প্রতিযোগিতা হতে হতে ঠিক হল শোভারাণী যাবে। এবং এ কথাও ঠিক হয়ে গেল যে, পরেশ এসেই নিয়ে যাবে।

কথা পাকা করে পরেশ চলে গেল। এবং, আশ্চর্য, এত বড় মানুষটা কথা ঠিক রেখে পরের দিন গাড়ি নিয়ে ঠিক বেলা বারোটায় এসে হাজির।

অতি ভদ্র এই মানুষটি। নিজে ড্রাইভারের পাশে বসে, পিছনে শোভারাণীকে বসিয়ে সে চন্দননগর থেকে রওনা হল কলকাতার দিকে।

পুরনো ইস্পাতে জং ধরে, পুরনো ইচ্ছারও রং বদলায়। একদা শোভারাণী পরেশকে কি চোখে দেখত, সে কথা থাক্; আজ শোভারাণী পরেশকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, এবং হয়তো একটু ঈর্ষাও করে।

পিছনে বসে শোভারাণী বলল, 'আপনার ছেলেপিলে ক'টি তা কিন্তু জানাই হল না।'

'আমার?' পিছন দিকে তাকিয়ে পরেশ বলল, 'জিরো। অর্থাৎ শূন্য। বিয়েই হয়নি।'

'তাই বুঝি? তবে, কবে আর করবেন?'

'এ যাত্রা বুঝি হয়ে উঠল না।' বলে অমায়িক ভাবে হাসতে লাগল পরেশ পুরকায়স্থ। কিছুক্ষণ বাদে পরেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কৃষ্ণপ্রসাদের কথা মনে আছে?'

'সে কে?' ইচ্ছে করেই শোভারাণী বলল।

'সেই-যে আমাদের শান্তিপুরের সেই কৃষ্ণপ্রসাদ। সে এখন বিরাট মানুষ, বিরাট ধনী, বিরাট প্রতাপ, ভীষণ ইনফ্লুয়েন্স। যাকে বলে বিগ ম্যান, এখন সে তাই।'

'তাই বুঝি?'

'তাই।' পরেশ বলল, 'ও হাতে থাকলে এখন ধূলোমুঠি সোনা হয়ে যাবে। ও এখন টাকার কুমির।'

শোভারাণী বলল, 'ও তো একটা বোকা। ওর আবার টাকা হল কি করে?'

'বোকা সেজে থাকত। ওটা ওর পলিসি। আসলে কিন্তু—'

গাড়িটা হঠাৎ ব্রেক কষায় ওরা সামনে ঝুঁকে গেল। পরেশের কথাটা তাই শেষ হল না। মিউজিয়মের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। সত্যি, একটা বিরাট এগজিবিশনের ব্যবস্থা

হয়েছে এখানে।

পরেশের খুব খাতির এখানে। গাড়ি থেকে নেমে সে শোভারাণীকে বেশ যত্ন করে নিয়ে গেল ভিতরে। ভলান্টিয়াররা সম্ভ্রমের সঙ্গে তাদের আগে-আগে হেঁটে পথ দেখিয়ে চলল।

বেশ সুন্দর এগজিবিশন। চন্দননগরেও ছোটখাট প্রদর্শনী মাঝে-মাঝে হয়। কিন্তু এমন বিরাট ও এত বিশাল ব্যবস্থা নয়। শোভারাণীর খুবই ভালো লাগল। পড়ুয়ার আর পণ্ডিতের পরিবার সে, ওসব মানুষ একটু ঘরকুনোই হয়ে থাকে। বাইরে-বাইরে এমন দৌড়ঝাঁপ ওরা করে না। সেইজন্যে জগৎটাও ভালোভাবে দেখা হয় না ওদের। জগৎ যে কত বিচিত্র জায়গা, জগতে কত-যে বিচিত্র মানুষ বাস করে, আজ এই এগজিবিশনে এসে শোভারাণীর সে সম্বন্ধে একটু-একটু ধারণা যেন হচ্ছে।

খুব সজ্জন মানুষ পরেশ পুরস্কায়স্থ। এত তার খ্যাতি, এত তার খাতির, এত কাজের মানুষ সে, তবু শোভারাণীকে নিয়ে কত যত্ন করে সব ছবি দেখিয়ে-দেখিয়ে বুঝিয়ে-বুঝিয়ে সে অনায়াসে সময় খরচ করে চলেছে। এতটুকু তাড়া যেন তার নেই, এতটুকু তাগাদা নেই। শোভারাণী বুঝতে পারছিল, মানুষের মধ্যে গুণ না থাকলে মানুষ কখনো এমনি-এমনি বড় হয় না।

অনেকক্ষণ ধরে তারা দেখে বেড়াল ছবির এগজিবিশন। ছবিগুলির মধ্যেই-বা কত বৈচিত্র্য। কোনো-কোনোটা অবশ্য শোভারাণীর বীভৎস লেগেছে, কোনো-কোনোটা তার বিশ্রী লেগেছে, কিন্তু সে তা প্রকাশ করেনি। কি জানি, তাতে আবার সে বোকা হয়ে না যায়।

ওদিকে প্রকাণ্ড লনে সামিয়ানা খাটানো। সেখানে রং-বেরঙের মস্ত-মস্ত ছাতি বসানো কয়েকটা। অনেক পুরুষ ও অনেক মেয়ে বসে-বসে চা খাচ্ছে, কফি খাচ্ছে, খাবার খাচ্ছে।

পরেশ শোভারাণীকে নিয়ে সেদিকে গেল। বলল, 'একটু রেস্ট নেওয়া যাক। এত ঘুরে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছি।'

একটা ছাতার নীচে মোটা-মত একটা মানুষ একা বসে স্মল-পাইপ চুষছে। কার জন্যে বুঝি অপেক্ষা করছে সে। ওরা সেখানে গিয়ে বসল।

ওরা আসতেই মোটা লোকটা আহ্লাদে গদগদ হয়ে বলল, 'বহুৎ আদমি এল-গেল। ভাবছি, আপনেরা আসতেছেন না কেন।'

শোভারাণী প্রথমটা ধরতে পারে নি, কে এ। তার পরেই যেন বুঝল। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই পরেশ পরিচয় করে দিয়ে বলল, 'এই সেই কৃষ্ণপ্রসাদ, মনে পড়ে একে?'

শোভারাণী উত্তর দেবার আগেই কৃষ্ণপ্রসাদ বলল, 'মনে পড়বে না কেন। বিস বরষ তো খুব একটা লম্বা সময় না যে, মানুষ বিলকুল ভুলে যাবে মানুষকে। লেকিন, মাঝে-মাঝে ভুল ভি হয়।'

অনেক গল্প করতে লাগল তারা। বহুদিন বাদে কৃষ্ণপ্রসাদ এসেছে বাংলাদেশে। এদেশ সে ছেড়ে গেছে, লেকিন মন থেকে তো মুছে যায়নি এই দেশ। এদেশের মাটির একটা জাদু আছে।

কৃষ্ণপ্রসাদ বলল, 'দুনিয়ার কত বদল হয়ে গেল। কত লড়াই হল, কত দাঙ্গা। লেকিন বহুৎ চিজ ঠিক থেকে গেল।'

কি কি ঠিক থেকে গেল সে কথা কৃষ্ণপ্রসাদ আর খুলে বলল না। কিন্তু সে যে খুবই খুশি হয়েছে, তার কথায় তা খুবই স্পষ্ট হতে লাগল।

পরেশ বেশি-কিছু বলছে না। মাঝে-মাঝে অবশ্য ছোটখাট মন্তব্য করছে।

কথায়-কথায় অনেক অন্তরঙ্গই বুঝি হয়ে গেল তারা। ওদিকে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যেও প্রায় নেমে এল।

কৃষ্ণপ্রসাদ বলল, 'পরেশবাবু তো বড় বিজি আদমি। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি চন্দননগরে। মিস্টার মুকার্জির সঙ্গে আলাপও ভি হোবে।'

পরেশ কোনো কথা বলল না। শোভারাণী একবার তাকাল পরেশের মুখের দিকে। পরেশ নিশ্চিন্ত আরামে বসে আছে অন্য দিকে চেয়ে। সেইভাবে বসেই সে বলল, 'উত্তম প্রস্তাব। বেশ হয় তবে।'

শোভারাণী বলল, 'আপনি যাবেন না?'

পরেশ বলল, 'যেতে পারলে তো বেশ ভালোই হত। কিন্তু এদিকে বড্ড জড়িয়ে আছি যে।'

অগত্যা। অগত্যা শোভারাণী চন্দননগরে ফিরে চলল কৃষ্ণপ্রসাদের সঙ্গে।

মস্ত গাড়ির পিছনে দুজন পাশাপাশি বসে চলল।

কৃষ্ণপ্রসাদ বলল, 'কত চেঞ্জ হয়ে গেল দুনিয়ায়, কত লড়াই, কত দাঙ্গা। কিন্তু আপনি তেমনি তাজা রয়ে গেলেন, তেমনি খুপসুরত।'

আধুনিক সাহিত্য

কথাটা সম্ভবত বড় বেশি স্পষ্ট, এবং নিঃসন্দেহে সেই স্পষ্টভাষিতা অপরাধ, কিন্তু বলতে বাধা নেই : আমাদের সাহিত্যে এখন এক শূন্যতার যুগ। হিসেব করলে দেখা যাবে, গত এক দশকে তেমন উল্লেখ্য গল্প, কবিতা, নাটক অথবা উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। অথচ আমাদের লেখকদের যে শক্তির অভাব আছে, তা নয়। ইতস্তত ছড়ানো অনেক ভাল অংশ আছে; কোনো লেখার আঙ্গিক আমাদের বিস্মিত করেছে; কোনো কোনো উপন্যাসে বৃহদারণ্য সত্ত্বেও এক আধটি চরিত্র রচনা সার্থক। কোথাও হয়ত কোনো প্রতীক অথবা চিত্রকল্পের ব্যবহার পাঠকের দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে, কোনো সফল রচনা গত দশকে একান্ত বিরল।

কিন্তু এমন হবার কারণ কী? এর উৎস অন্বেষণে আমাদের কিছু প্রয়াসেই প্রতিভাত হবে আমাদের সাহিত্য-মন এবং আমাদের বাইরের পৃথিবীর মধ্যে এক অনুলোম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বাঙলা সাহিত্য হঠাৎ যেন দলছুট। তাই সম্ভবত অশ্রান্ত বর্ষণে সব কিছু ধুয়ে মুছে নতুন সম্ভাবনার শিহরণ সৃষ্টি করতে পারল না। অথচ আমাদের লেখকেরা একক অস্তিত্ব নিয়েও এগিয়ে যেতে পারেন নি। আন্দোলনের গতি ব্যাহত হল। অন্য কথায় বলা যায় : সাহিত্যকে ভিত্তি করে নতুন কোনো আন্দোলনই গড়ে উঠল না। এবং সম্ভবত একটি পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে সাম্প্রতীক সাহিত্য বুঝি এক বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব। তাই তার মূল্যায়নও অসম্পূর্ণ।

আমাদের সাহিত্যের একটি ধারাবাহিকতা ছিল। যদিও এই যাত্রা কখনই কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তবু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও একটি আন্দোলনের সম্পূর্ণ বৃত্তে আমরা স্থিত ছিলাম। তার কারণ, সাহিত্য অনেকখানি অশিক্ষিত পটুত্ব সত্ত্বেও অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতায় উজ্জ্বল ছিল। তাছাড়া ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, এই সাহিত্যিকরা বুদ্ধিবাদের নিশ্চেষ্ট অভিধায় অবসিত হতে দেননি। তাঁদের বক্তব্যের বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা কখনও অনাত্মীয় এবং অপরিচিত জগতে হারিয়ে যাইনি। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আনুভূমিক। তাই সহজেই তাঁরা বক্তব্য খুঁজে পেতেন। ঘটনার অন্বেষণে তাঁদের ঘুরে বেড়াতে হত না। এমনকি, কদাচিত দেখা গেছে অতীতচারণে অভিভূত, অথবা ইতিহাসের আশ্রয়ে।

কিন্তু এই দশকের লেখক, প্রবীন এবং নবীন নির্বিশেষে ইতিহাস আশ্রয়ী অথবা আঙ্গিক সর্বস্ব। এবং যেহেতু তাঁরা সামাজিক মানুষ হওয়া সত্ত্বেও অ-সামাজিক, তাই সম্ভবত উটপাখীর মতো বালুর স্তূপে মুখ লুকিয়ে আছেন। আর এরই মধ্যে যাঁরা কিছুটা সমাজ সচেতনতার দাবী করেন তাঁরা যেন একচক্ষু হরিণ। তাই তাঁরা জীবন বিকৃতিকে সম্পূর্ণ জীবন বলে ভুল করেন। এ পক্ষের বক্তব্য : আমাদের জীবনে বৈচিত্রের অভাব। শুধু তাই নয়, যুদ্ধ ইউরোপের জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, তা মাত্র সেখানকার রাজনীতিরই আদল বদলে দেয়নি, সামাজিক জীবনেরও নতুনভাবে বিন্যাস করেছে। এই রূপান্তর লেখক মানসকে বিচলিত করতে বাধ্য এবং করেছেও।

অথচ বাঙলাদেশে তাঁরা নিরুত্তাপ জৈব জীবনের অস্তিত্বেরই অভিজ্ঞতা পেয়েছেন।

ফলে বাইরের জীবন থেকে সরে এসেছেন এক কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গীর ছায়ায়।

এ দুপক্ষ বাদ দিয়ে আরো একটি নতুন পক্ষের অস্তিত্ব সহসা দৃশ্যমান। এঁদের সাহিত্য আপাত বিশ্বাস নির্ভর।

সম্ভবত এই মানসিকতায় বিব্রত লেখক কল্লোল-গোষ্ঠীর অনুসরণে কোনো একটি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, লক্ষ্যের দিগন্তে তাঁরা পৌঁছুতে পেরেছেন কি না। তার অন্যতম কারণ, কল্লোলযুগের আপাত সমাজ বিরোধিতাই তাঁদের আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু পূর্বসূরিদের অভিজ্ঞতা তাঁরা বিস্মৃত। মনে হয়, এই নতুন লেখকদের কেন্দ্রবিন্দুর অভাব—বৃত্ত রচনা করবেন কেমন করে? সাহিত্য স্বতোৎসারিত নয়, অভিজ্ঞাত; এবং নৈতিমূলক মনোভঙ্গী কোনোমতেই তার সহায়ক হতে পারে না। তাছাড়া, বাইরের পৃথিবীর কোনো প্রমিত জ্ঞান না থাকায় সে সম্পর্কে সংবেদন অপরিহার্য। আর এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত আন্তরিকতা ও শিল্পচরিত্র।

প্রিস বিন হামেদ শারহাদির উপন্যাস *A Life Full of Holes* পড়ার পর, বিশেষ করে এ কথাগুলি স্মর্তব্য। সীমিত অক্ষরজ্ঞান সত্ত্বেও তিনি শিল্পী এবং সে কারণেই তিনি সার্থক। অথচ উপন্যাসটির তিনি লেখক নন। তিনি তাঁর কাহিনী বিবৃত করেছেন আর তা একটি উপন্যাসের সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। নিঃসন্দেহে তিনি একজন নিপুণ কথক, এবং যেহেতু একজন শিল্পীও, আমাদের কথনই মনে হয়না প্রবক্তার বাক চাতুর্যে আমাদের মনে অধ্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর কাহিনী আগাগোড়া এক সহজ স্বচ্ছ তরঙ্গ, আর কোথাও আলো—কোথাও মেঘ। আবার কখনো মনে হয় ঝরে বিধ্বস্ত।

মগরেবী আফ্রিকার অধিবাসী শারহাদি, আফ্রিকার সাধারণ মানুষের জীবনের চিত্রকেই রচনা করেছেন। সতেরটি পরিচ্ছেদে সমৃদ্ধ উপন্যাসটিকে মনে হতে পারে সতেরটি ভিন্ন রঙের, ভিন্ন ফুলের মালা। নিপুণ রচনার গুণে, প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ এক একটি সুন্দর অথচ সার্থক গল্প।

অবশ্য এই রচনার কৃতিত্ব কার বেশি, তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে। কারণ উপন্যাসটি রচিত হয়েছে যৌথ প্রচেষ্টায়। শারহাদির ইংরেজীর জ্ঞান নেই। উত্তর আফ্রিকার পার্বত্য মুসলমানের মতো মগরেবী আরবী ভাষায় তিনি কথা বলেন। কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য এখানেই যে তিনি লেখকের মন নিয়ে গল্প বলেন এবং সফল শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ঘটনার বিন্যাস করেন।

নিজের ভাষায় গল্প বলেছেন শারহাদি। আর তাকে প্রতিবর্ণে লিপিবদ্ধ করেছেন বিখ্যাত উপন্যাসিক পল বাওলেস। শারহাদির কথা যাতে কোনোক্রমে হারিয়ে না যায়, সেজন্য বাওলেস অন্তহীন আয়াস স্বীকার করেছেন। কথাগুলো প্রথমে তিনি টেপে রেকর্ড করেছেন, এবং তারপর তার আক্ষরিক অনুবাদ। নিঃসন্দেহে এ এক অভিনব আঙ্গিক!

উপন্যাসটি পড়লেই বোঝা যায়, গল্প রচনায় শারহাদির জন্মগত অধিকার। তাঁর রচনার প্রধান সম্পদ; অনুভব, অবেগ ও অলঙ্করণে অনীহা। আর এই বিশিষ্ট উপাদানগুলি যাতে সম্পূর্ণভাবে অবিকৃত থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়েছেন বাওলেস। রচনার কৃতিত্ব আমাদের শারহাদিকেই দিতে হয়। বাওলেসের যদি কিছু প্রাপ্য থাকে, তা একান্ত সার্থক অনুবাদের।

উপন্যাসের পটভূমি উত্তর আফ্রিকার জনসাধারণ। যে সমাজে নানা স্তরের মানুষ—চোর, ডাকাত, বেশ্যা এবং সমকামী। এদের জীবন ধারণের জন্য ভয়াবহ অ্যাডভেঞ্চারে নামতে

হয়। তা ছাড়া অপরিণত দেশের মিথ্যে আইনের শাসন। অথচ অবাক হতে হয় শারহাদির সংযমে। কোথাও তিনি হিতোপদেশের অনুশাসন স্মরণ করিয়ে দেন নি।

তরুণ হামিদের বক্তব্য একটি বালকের নৈতিক অধঃপতনের কাহিনী নয়। বেশ বোঝা যায়, অদৃষ্টবাদকে আশ্রয় করে শারহাদি জীবনের অন্ধকার অধ্যায়কে বিশ্লেষণ করতে চান নি। এক বিষয়কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, অবিচার, দারিদ্র এবং অনাহারকে তিনি চিত্রিত করেছেন। কোথাও পাঠকের সহানুভূতি অর্জনের প্রয়াস দেখা যায় না। তাঁর রচনায় এমনই এক ঐশ্বর্য, যা সারল্য সত্ত্বেও এক উদ্দেশ্যবিহীন ব্যর্থ ভবঘুরে মানুষের আখ্যায়িকায় পরিণত হয় নি। তাঁর রচনার আগাগোড়া উত্তর আফ্রিকারই মতো দৃশ্যময় এবং স্বভাবতই বর্ণময়।

এ কারণেই উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য, আধুনিক সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজনা। সাফল্যে পৌঁছাবার জন্য তিনি কোনও হাতিয়ার গ্রহণ করেন নি। অথবা ঘটনাগুলির কোনো দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় মন দেন নি।

শারহাদির উপন্যাস প্রমাণ করল সাহিত্যের বড় উপকরণ সংবেদন। আর সেই সম্বলই লেখককে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই প্রসঙ্গেই আরো বেশি হতাশ বোধ করতে হয়। আমাদের এই উর্বর দেশে অজস্র ফসল। আমাদের কাজ তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ঘরে তোলা। আমরা সেখানে ব্যর্থ। অন্য দেশের তুলনায় যেন অনেকটা পিছিয়ে। অথচ এমন হবার কোনো কারণ ছিল না।

তার চেয়েও বড়ো কথা, এই অক্ষমতা আড়াল করতে আমাদের ভূমিকার সাহায্য গ্রহণ। সসঙ্কোচে বলি : আমরা এখন বাইরের জীবনের মিথ্যাচারের শিকার। মানসিকতা আমাদের বিধ্বস্ত হয়ত বিপর্যস্ত। তাকে লুকোতে গিয়ে আমাদের বিশীর্ণ সঞ্চারণ। তাই মনে হয়, চমক সৃষ্টি হতে পারে, এমন কিছু করার মোহ থেকে যদি আমরা স্বেচ্ছা নির্বাসন গ্রহণ করি তবে হয়তো আমাদের মঙ্গল হবে। পৃথিবীকে বুঝতে এবং জানতে শেখাবে। তখন আর শুধুমাত্র যৌন ইন্দ্রিয়ই মানুষের বিচারের একমাত্র মাধ্যম প্রতীত হবে না।*

নৃপেন্দ্র সান্যাল

* A Life Full of Holes. *By* Driss ben Hamed Charhadi. Tape-recorded by Paul Bowles. Weidenfeld & Nicolson. London. 18s.

সমালোচনা

স্বপ্নপ্রয়াণ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক : পুলিনবিহারী সেন। প্রাপ্তিস্থান : জিজ্ঞাসা। কলিকাতা, ২৯। মূল্য ছয় টাকা।

স্বপ্নপ্রয়াণ প্রথম প্রকাশ হয় ১৮৭৫ সালে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৯৬ সালে, তৃতীয় নবতম সংস্করণ ১৯১৪ সালে এবং বর্তমান পুনর্মুদ্রণ ১৯৬৪ সালে। এই কাব্যের জন্ম জোড়াসাঁকোর ঘরোয়া সাহিত্যসমাজকে আবেগচঞ্চল করে তুলেছিল সে খবর পাই রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে। কিন্তু দেশের বৃহত্তর সাহিত্যপাঠকসমাজে স্বীকৃত ও আদর পেয়েছে অতি সামান্যই। কয়েকজন বিদগ্ধ সমালোচক দীর্ঘকালের ফাঁকে ফাঁকে এই কাব্যকে অকুণ্ঠ প্রশস্তি জানিয়েছেন; এঁদের মধ্যে আছেন সতীশচন্দ্র রায়, প্রিয়নাথ সেন ও শ্রীকানাই সামন্ত প্রভৃতি। যদিও দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর এই মানসপুত্র কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করবে—অন্ততঃ সুধীসমাজে—জীবনের শেষ পর্যন্ত এই আশা পোষণ করেছিলেন, দুঃখের বিষয় তাঁর সে আশা সফল হয় নি। এই ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্ববর্তী সমালোচকেরা করেছেন। আজও সেই প্রসঙ্গ উত্থাপনের দরকার আছে। তবে সুখের কথা এই যে এই নূতন সংস্করণ অতি সহজগ্রাহ্য ও শোভন আকৃতিতে কাব্যগ্রন্থখানিকে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেছে এবং শুধু তাই নয়, এর এতদিনকার অনাদর-রহস্য সমাধানের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ও আলোচনা একত্র গ্রথিত করে এনে দিয়েছে। এর থেকে নতুন দৃষ্টিতে এই কাব্যকে বিচার করে দেখবার যথেষ্ট সহায়তা করা হয়েছে বলে মনে করি।

এই কাব্যের রসগ্রহণে সত্যকার কতকগুলি বাধা ছিল, কিন্তু সেগুলিকে দূর করে লেখক-পাঠকের মধ্যে একটা সহজ সংযোগ স্থাপন করে দেওয়া অসম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সহজ সংকোচবশেই জীবনস্মৃতির সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের বেশি নিজের বড়দার সম্বন্ধে আরো বিস্তৃততর আলোচনা করতে পারেন নি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা বলতে পারি যে প্রধান বাধা হল এই কয়টি : ১. এই কাব্যের নূতন বিষয়বস্তু ও তার বিন্যাস; ২. নূতন ছন্দ যার গতিভঙ্গী প্রথমপাঠে অনায়ত্ত থেকে যাওয়াই সম্ভব; ৩. সাধু ও লৌকিক শব্দের অবাধ সমন্বয়ে এমন ভাষাবন্ধের সৃষ্টি যা পাঠকচিত্তে হঠাৎ একটা অসামঞ্জস্যের ধারণা এনে দেওয়াই স্বাভাবিক; ৪. লেখকের যে কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য এই ছন্দ-ভাষা-ভাবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তার মূলে আবেদন বা স্টাইল সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা : লেখকের মেজাজ প্রধানতঃ আখ্যানকার বা নাট্যকারের, তাঁর সুরে আসলে কৌতুকের, ব্যঙ্গের, মননশীলতার, কল্পনার না লিরিক ভাবাবেশের—আপাতদৃষ্টির এই-সব প্রশ্নের নিশ্চিত সমাধানের অভাব; ৫. এবং সব শেষে দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিরূপ সম্বন্ধে বিশেষ এক ধরনের খ্যাতি যা তাঁর কবিত্বসম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করলে আশ্চর্যের কিছুই নেই। এ ছাড়া নতুন বানানরীতির প্রচলন করার চেষ্টাটাও, যথা 'দেখে' বানান 'দেখ্যা', পাঠককে বিভ্রান্ত করে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ একজন আত্মভোলা দার্শনিক, তিনি নানা বিচিত্র এবং অনেক সময়ে উদ্ভট

খেয়ালে মেতে থাকেন, নানা খুঁটিনাটি উদ্‌ভাবনের দিকে তাঁর নজর ও সরল শিশুসুলভ তাঁর উচ্চ হাসি তাঁর ভিতরকার মুক্ত জ্ঞানী স্বভাবটিকে সহজেই লেখকের কাছে প্রত্যক্ষ করে তোলে—এই ধরনের চারিত্র আরোপ কাব্যের সেই প্রথম প্রকাশের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল ও আছে যে, এও যে এই খেয়ালী মানুষটির শুধুই একটা খেয়াল নয়—(তা সে যত প্রশংসনীয় খেয়ালই হোক,) এর মধ্যে সত্যই যে একটি অবিসম্বাদ্য কবিপ্রাণ নিজের মর্মবাণী প্রকাশ করেছে একথা ভাবাই ছিল শক্ত; তাই রসজ্ঞ পাঠকরাও দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষা ছন্দ ইত্যাদির সাধুবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন, এই কাব্যের গভীরে নিহিত কাব্যস্পন্দ লক্ষ্যও করেন নি। তাই এই কাব্য থেকে গেছে সাহিত্যক্ষেত্রে একটা 'ঘটনা' মাত্র, প্রেরণা নয়। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথের উক্তিকেও অনেকের মনে হতে পারে, আমার তো তাই হয়েছিল, 'বড়দা'র প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন, কাব্যতত্ত্বদৃষ্টির কঠোর অপক্ষপাত বিচার নয়। কাব্য-সমালোচনায় ব্যক্তিগত সাক্ষ্যের বেশ একটা মূল্য আছে। আমি অন্ততঃ স্বীকার করি যে এর আগেই আমার যে অস্পষ্ট অনুমান গড়ে উঠেছিল বিশ্বভারতী লাইব্রেরিতে রক্ষিত স্বপ্নপ্রয়াণের ভগ্নপ্রত্নবিশিষ্ট একটি সংস্করণ অতি সন্তর্পণে ব্যবহার করে—যার ফলে অনায়াসে অগ্রসর হওয়া হয়েছিল একেবারেই অসম্ভব—তাই অতি সহজেই প্রতিপন্ন হল এই নতুন সংস্করণটি ব্যবহার করে। স্বপ্নপ্রয়াণ পুরোনো পুঁথির মত সাবধান-স্পর্শ ও অভিনিবেশ চায় না, চায় সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের—এমন কি বলিষ্ঠ প্রাণোদ্বেল সাহচর্যের সম্পর্ক। সেইরকম একটি সম্পর্কস্থাপন সম্ভব হয়েছে এই নতুন সংস্করণের সহায়তায়। এবং তার ফলে এই কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা তাঁর দার্শনিকতার চেয়ে কম সত্য নয়। স্বপ্নপ্রয়াণে তিনি নিজেই ঐ কবিনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ, এবং নিজের আত্মবিশ্লেষণে তাঁর সন্দেহমাত্র নেই যে তিনি কবি। প্রিয়নাথ সেনের কাছে লেখা তাঁর চিঠিতেও এ বিষয়ে তাঁর দৃঢ়প্রত্যয়ের ইঙ্গিত আছে।

এই মূল প্রত্যয়টি লাভ করলে অন্য সন্দেহ-সমস্যাগুলি দূর করা এমন-কিছু শক্ত নয়। নতুন বানানপদ্ধতি এই নতুন সংস্করণেও রাখা হয়েছে। বাংলা ভাষা যে এতদিনেও এই নতুন রীতি গ্রহণ করে নি তা আমরা জানি, কাজেই এই উদ্‌ভাবন বা সংস্কার-প্রস্তাবকে উপেক্ষা করলেই আর ঝঞ্ঝাট নেই।

এখন বাকি রইল যে-তিনটি প্রশ্ন তারা পরস্পরসম্বদ্ধ। তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র কি ও তার সঙ্গে তুলনায় তাঁর বিষয়নির্বাচন কতটা সার্থক ও সমীচীন হয়েছে—এই হল একটা প্রশ্ন। সেই অভিজ্ঞতার যথাযথ কাব্যরূপায়ণের সামর্থ্য তাঁর ছিল কিনা—তাঁর কবি-প্রতিভার বিশেষ গুণ, ক্ষমতা, মেজাজ কতটা এই কাজের উপযোগী ছিল—এই হল দ্বিতীয় প্রশ্ন। আর তৃতীয় হল তাঁর সেই নির্বাচিত কাব্যপ্রয়াসের উপযোগী ছন্দ ও ভাষা তিনি খুঁজে বা তৈরি করে নিতে পেরেছেন কি না।

স্বীকার করতে হবে যে জীবন-অভিজ্ঞতায় দ্বিজেন্দ্রনাথের কিছুটা অপ্রাচুর্য ছিল। ইন্দ্রিয় ও হৃদয় সংবেদন ও রসবোধের ক্ষমতা যথেষ্ট থাকলেও জীবনের ও বাস্তব জগতের কিছু অভিজ্ঞতার পরই তাঁর অন্তরের মানুষটি বাইরে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেয়েছিল। সম্ভোগ ও সন্তাপ, প্রাপ্তি ও বঞ্চনায় মেশানো যে জীবন তার থেকে বিদায় নিয়ে অন্তরের জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহনের চেষ্টা এবং তার ফলে 'দ্বিজেন্দ্রের দ্বিজত্বলাভ'—এই হল তাঁর অন্তর্জীবনের ইতিহাস। স্বপ্নপ্রয়াণে এই দ্বিজত্বলাভের বর্ণনা করেছেন কবি এইভাবে—

হৃদিমাঝে পাইয়া চেতন-রবি
ফুটিল নয়ন-পদ্ম! 'দ্বিজু হনু' মনে ভাবে কবি।
ব্রহ্মতালু ভেদি'
ভবপাশ ছেদি',
উঠে জ্ঞানানলশিখা হিরণ্ময় ছবি।

এ কোলরিজের মতো শুধু অমূর্ত চিন্তা ও তত্ত্বের রাজ্যে কবিচিত্তের আত্মবিসর্জন নয়। এ ব্রহ্মাস্বাদের সমুদ্রে কবিসুলভ রসবোধের সার্থক সমাপ্তি। কিন্তু যাত্রাযাতের সেতুটি তৈরি না থাকলে কবির জগৎ ও অধ্যাত্মদর্শনের জগৎ একসঙ্গে টিকতে পারে না যেমন টিকেছিল রবীন্দ্রনাথের বেলায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাই লৌকিক জীবন ও তার কাব্য-সম্ভাবনাকে দ্রুত পেরিয়ে উত্তীর্ণ হলেন আত্মজ্ঞানের জগতে। এই পেরিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতাটুকুই তাঁর এই কাব্যের বিষয়। বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে এই অভিজ্ঞতার পরিধিসংকোচ যদিই বা স্বীকার করি, তার জীবনসত্যতা ও যথার্থ্য স্বীকার করবার উপায় নেই, আর এ কথা নিশ্চয় মননশীলতা কল্পনা ও রসবেদিত্বের দ্বারা সেই অভিজ্ঞতার সুনিপুণ ব্যবহারে দ্বিজেন্দ্রনাথ অনন্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞের যে বর্ণনা আছে তারি আদর্শের অনুসরণে কূর্ম যেমন তার অঙ্গগুলিকে সংহরণ করে তেমনি আত্মসমাহিত হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।

কবি দ্বিজেন্দ্রের বিষয়গুলিও ক্রমে গেল বিদায় নিয়ে এবং তাঁর কাব্যরসও রসের অতীত পরতত্ত্বকে পেয়ে নিবৃত্ত হল। কিন্তু তার আগেই কবিপ্রতিভার যেটুকু স্ফুরণ ঘটে গেল তার থেকে দেখা যায় তিনি অনেকটা কাশীরাম দাস কৃত্তিবাসের মতোই মহাকবিসুলভ চিত্তসম্পদ্‌ ও কবিপ্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন। জীবনের বহুবিচিত্র রসকে গ্রহণ ও রূপ-দানের সহজসিদ্ধ ক্ষমতা তাঁর ছিল। মহাকাব্যে যেমন প্রয়োজনমতো গভীর লঘু সুরে বিচিত্র রসের অবতারণা করতে হয় এবং সব মিশিয়ে একটা ভাষার ও ছন্দের তৎপরতা ও কাহিনীর প্রবহমানতা রক্ষা করে যেতে হয় দ্বিজেন্দ্রনাথও স্বপ্নপ্রয়াণে নিপুণভাবে তাই করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যে গৃহিণীপনার অভাব'—এই মন্তব্য যে অর্থে সঞ্জীবচন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রনাথের বেলা খাটে না। বরং একটা বহুঅবয়বযুক্ত পরিকল্পনাকে রূপায়িত করে তোলার মতো সরল ও তীক্ষ্ণ সংগঠনী বুদ্ধিরই সাক্ষ্য পাওয়া যায় স্বপ্নপ্রয়াণে। কিন্তু গৃহিণীকে খাদ্যের আহরণ ও প্রস্তুতি ছাড়া আবার লোকের প্রয়োজন রুচি ও মেজাজ বুঝে পরিবেশনও করতে হয়। এইখানেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারে শিশুর মতো জ্ঞানবিবেচনাহীন। পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্তিকর অনেক কিছু করে তিনি মনে মনে কৌতুক অনুভব করেছেন, কিম্বা একটা নতুন কিছু করার আত্মপ্রসাদ। তাতে যে তাঁর কাব্যের প্রধান আকর্ষণ ঢাকা পড়ে যেতে পারে, পাঠকরাও বিমুখ হতে পারে এ খেয়াল তাঁর হয় নি। শুধু অদ্ভুত বানানপ্রথাই নয়, রূপক-আকারে গল্প রচনা করতে গেলে যে-যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তাও তিনি করেন নি। পাত্রপাত্রীর এমন নাম দিয়েছেন যা নীতিমূলক allegory-তেও বেমানান হত। যথা 'সখারস', 'দাস্যরস'। আমাদের যাত্রাগানে নিয়তি, ধর্ম, বৈরাগ্য ইত্যাদি এক-একটি চরিত্র হিসাবে আসরে এলে তাও দর্শকরা

মেনে নেয়, কারণ, তাদের চরিত্ররূপ অনেক পরিমাণে প্রথাসিদ্ধ। 'সখ্যরস' শব্দটাকে একটা প্রচলিত কোনো নামের আকার দেওয়া শক্ত ছিল না। চরিত্রটির মধ্যে সত্যিকার জীবনের হৃৎস্পন্দনের কিছুটা ধ্বনি পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ ধরনের নাম দেওয়ার ফলে প্রথমেই পাঠকচিত্তে আসে একটা ঔৎসুক্যের অভাব। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর কাহিনীতে সত্যকার জীবনরস সঞ্চার করেছেন অনেক পরিমাণেই, কল্পনার প্রতি কবির আকর্ষণ, লালসার প্রতি কাম, সখ্যরসের সঙ্গে প্রণয় প্রভৃতি বর্ণনায়। বিশেষতঃ বিষাদপুরের হা হা হু হু রাজা ও তার মন্ত্রী, রসাতলের অদ্ভুত বাসিন্দাদের কার্যকলাপে যথেষ্ট প্রাণরস সঞ্চারিত হয়েছে। সমর প্রয়াণের যুদ্ধবিরোধ যথেষ্ট বাস্তব প্রত্যক্ষতা ও নাটকীয় অভিঘাতের সঙ্গে কল্পিত ও বর্ণিত হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথের লৌকিক ভাষার দৃঢ়ভিত্তিতে রচিত সুস্পষ্ট তীক্ষ্ণ ও যথেচ্ছ সঞ্চরণক্ষম ভাষাব্যবহারের কৃতিত্ব কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস ভারতচন্দ্রের অনুরূপ কৃতির সঙ্গের তুলনীয়। শান্তিপ্রয়াণে মায়াবলে পশুতে পরিণত যে-সব মানুষ পশুত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে নিজ রূপ ফিরে পাচ্ছে তারা হোমারের ওডিসির সেই Circe-ও তার নষ্টামি মনে করিয়ে দেয়, কামরূপে মানুষকে ভেড়া করে রাখার স্মৃতিও উদ্রেক করে। কিন্তু রূপকভেদ করে নানারকমের চরিত্রবিকৃতির যে আলেখ্যগুলি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ তা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। স্পেন্সরের চেয়ে তা কম নয়। এই বিভিন্ন পর্যায়ের অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাঁর কাব্যের ভাষা সুর রস ও প্রয়োজনমতো বদলেছে। এবং বিস্তৃততর আলোচনার সুযোগ পেলে দেখানো যেত রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-কবিতা, খামখেয়ালি কবিতা, উদ্ভটরসের কবিতা : যথা, হিং টিং ছট, থাপছাড়ার কবিতা ইত্যাদি তার দ্বারা প্রভাবান্বিত।

তা ছাড়া কণিকায় রবীন্দ্রনাথ যে ধরনের চকিতচিন্তাস্ফুরণ এক-একটি কবিতায় ধারণ করবার চেষ্টা করেছেন সেই ধরনের চিন্তায়ও দ্বিজেন্দ্রনাথের পারদর্শিতা উল্লেখযোগ্য—

কিন্তু সখে মাটিকে ছাড়িয়া দিলে
শোভাশূন্য ভোঁ ভোঁ ছাড়া আর কিছু থাকেনা নিখিলে।
জ্ঞানীজনে বলে—
মাটিতেই ফলে
চতুরবরগ ফল, ফলাতে জানিলে।

এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধে শ্রীকানাই সামন্ত সত্যকার লিরিক কবিতার সুর ও ছন্দেও দ্বিজেন্দ্রনাথের দক্ষতার ইঙ্গিত করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কোনো কোনো কবিতার উপর তার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। এবিষয়ে দীর্ঘতর আলোচনা হওয়া উচিত বলে শ্রীসামন্ত যে মন্তব্য করেছেন তার সম্পূর্ণ সমর্থন করি। সে অবকাশ এখানে নেই। তবে এইটুকু উল্লেখ করতেই হবে যে মাঝে মাঝে সুর বদলে ছন্দ বদলে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছেন ঠিক যেন সংস্কৃত শ্লোকের ছাঁদে কবিতা—যা বিশেষ করে কালিদাসের স্মৃতিরণিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাসাশিহরিত কবিতারও পূর্বাভাস আছে অনেক পঙ্‌ক্তিতে—

তোলো তোলো হে মলয় ইহার আঙুল দুটি ধরি—
আর উঠিবে না!
কেন আর ঘুরিছ গো মধুকর গুন গুন করি—
আর ফুটিবে না!
মরণেরে বরিয়াছে পরাণের প্রিয়—

ভুলানে কথায় আর কান দিবে কিও!

পৃথিবীতে 'চাবিবন্ধ হৃদয় সকলি' এই দুঃখে ম্রিয়মান কবিকে সুসঙ্গ (এই আবার দ্বিজেন্দ্রনাথের নামকরণের আর এক নমুনা) যা বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল সেই চমৎকার কাব্যবুহকরোমাঞ্চিত পদগুলি তুলে আমরাও আজ বন্দনা করি কবি দ্বিজেন্দ্রনাথকে। তাঁর কাব্য সাময়িক অবহেলায় ভাগ্যের ঝড়ঝাপটে লুপ্ত হবার নয়। এই কাব্যের 'সদানন্দ শাখায়' পাঠকপাখির কলরব শুরু হবে—স্বপ্নপ্রয়াণের এই নূতন সংস্করণ প্রকাশ আশা করি তারই সূচনা করছে।

অরণ্যের পাখী তুমি, বিলাপের ধ্বনি কেন মুখে!
চিরকাল তুমি অরণ্যের পাখী, থাকিবেও তথা
চিরকাল। বলিতেছি আমি সেই অরণ্যের কথা,
যে অরণ্য বাতাসের সনে মুখোমুখি কথা কয়—
ডরে না ঝড়-ঝাপটে, দিগন্ত-প্রাচীরে বন্ধ নয়,
আপনে আপনি রহে বিস্তারিয়া সদানন্দ শাখা।

ছন্দ ও মিল রচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথের অসাধারণ সাফল্যের বিষয় আলোচনা আশা করি যোগ্য ব্যক্তিরা করবেন।

সুনীল সরকার

Words. *By* Jean-Paul Sartre. Hamish Hamilton. London. 21*s*.

আত্মচরিতের ইতিহাসে খ্যাতনামা ফরাসী লেখকদের দান উজ্জ্বল হয়ে আছে। নির্ভীক আত্ম-উন্মোচনে তাঁদের তুলনা মেলা ভার। রুশোর "কনফেশানস্" ও আঁদে জিদের "ইফ ইট ডাই" বিশ্ব-সাহিত্যের দুটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। সিমন দ্য বোভোয়ার তাঁর আত্ম-জীবনীতে সার্তর-এর আত্ম-চরিতের আসন্ন প্রকাশ সম্বন্ধে উল্লেখ করবার পর থেকেই একটি চাঞ্চল্যকর বিবরণীর জন্য আশা জেগেছিল। তাই প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই "ওয়ার্ডস"-এর কার্টতি হয়েছে অভূতপূর্ব। কোনো জীবনী-গ্রন্থের জন্য এমন চাহিদা এর পূর্বে কখনো হয়নি।

রুশো বা জিদের স্বীকৃতির মতো চাঞ্চল্যকর কিছু আশা করলে পাঠককে হতাশ হতে হবে। বর্তমান গ্রন্থে সার্তর মোটামুটি তাঁর বারো বছর পর্যন্ত জীবনের কথা বলেছেন। সুতরাং অনালোকিত অধ্যায়ের চমকপ্রদ উদ্ঘাটনের সুযোগ লেখক পাননি। তেমন ঘটনা কিছু আছে কিনা এবং থাকলে তা প্রকাশ করবার সুযোগ তিনি পরবর্তী খণ্ডে গ্রহণ করবেন কিনা, সেটা আবার জল্পনার বিষয় হয়েছে।

বারো বছরের বালকের জীবনেও যৌনচেতনা দেখা দেয়। সে চেতনা মনের অবচেতন স্তরে সঞ্চিত থেকে পরবর্তী জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। ফ্রয়েডপন্থী হয়েও সার্তর তাঁর যৌনচেতনার উন্মেষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। তরুণী বিধবা মাকে তাঁর কুমারী বলে মনে হত; বড় হয়ে পারিবারিক গঞ্জনার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য মা-কে বিয়ে করবেন, এই ছিল সার্তর-এর সংকল্প। এই নির্দোষ শিশুকল্পনা ছাড়া কোথাও বিবাহ কিংবা যৌন-

ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়নি। মা-র প্রভাবের জন্যই হয়ত এমন হয়েছে। মা ছেলেকে মেয়ের মতো রাখতে চাইতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, I was to have the sex of the angles, indeterminate but feminine round the edges.

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ডাঃ সার্তর গ্রামের জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করলেন উত্তরাধিকারসূত্রে অর্থপ্রাপ্তির আশায়। কিন্তু বিয়ের পরই জানতে পারলেন শ্বশুর আসলে নিঃস্ব। রাগ গিয়ে পড়ল স্ত্রীর উপর। শাস্তি হিসাবে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ডাঃ সার্তর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন নি। অবশ্য তাই বলে স্বামীর কর্তব্য তিনি অবহেলা করেন নি। পত্নী তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন দুই পুত্র ও এক কন্যা।

এক ছেলে জাঁ-ব্যাপ্তিস্ত নৌবাহিনীতে যোগ দিয়ে কোচিন-চীন থেকে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে দেশে ফিরলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পরিচয় হল পরিবারের উপেক্ষিতা তন্বী অ্যান-মেরি সোয়াইটজরের সঙ্গে। পরিচয় প্রেমে পরিণত হবার পূর্বেই তাঁদের বিয়ে হল। এঁদেরই সন্তান জাঁ-পল সার্তর।

১৯০৫ সালে পুত্রের জন্মের পরেই জাঁ-ব্যাপ্তিস্ত অন্তিম শয্যা গ্রহণ করলেন। অ্যান-মেরি রুগ্ন স্বামীর সেবা করতে বসে ভুলে গেলেন শিশু পুত্রকে। মাইনে করা দাইয়ের উপর ভার পড়ল জাঁ-পলকে দেখাশোনা করবার। স্বামীর মৃত্যুর পরে অ্যান-মেরি কর্তব্যের দায় থেকে মুক্তি পেলেন; ছেলে ফিরে এল মা-র কোলে।

জ্ঞান হবার পূর্বে পিতাকে হারানো সার্তর সৌভাগ্য বলে মনে করেন। পিতার নিরন্তর চেষ্টা থাকে পুত্রকে নিজের ছাঁচে গড়ে তোলবার। পিতার চিন্তা-ভাবনা এবং অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার বেদনা পুত্রের চেতনাকে আজীবন আচ্ছন্ন করে রাখে। পিতার মৃত্যু তাঁকে সুপার-ইগোর হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে।

কিন্তু মা-র বন্দীদশা হল নতুন করে। সহায় সম্বলহীন অ্যান-মেরির বাবার আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। চার্লস সোয়াইটজর (বিখ্যাত আলবর্ট সোয়াইটজর এই পরিবারের লোক) অবসর নেবার কথা ভাবছিলেন। বিধবা মেয়ের দায়িত্ব এসে পড়ায় তা আর হল না। সে জন্য অ্যান-মেরি সর্বদা কুণ্ঠিত হয়ে থাকতেন। অকস্মাৎ বিয়ে করা, এত তাড়াতাড়ি মা হওয়া এবং নিঃসম্বল বিধবা হয়ে ফিরে আসা, আত্মীয়স্বজন সুনজরে দেখেনি। পরিবারে কেউ তাঁকে মর্যাদা দেয়নি, তিনিও এই অবস্থা স্বীকার করে নীরবে সকলের সেবা করতেন। শিশু হলেও সার্তর মা-র অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিও মা-কে শ্রদ্ধা করতেন না, করতেন করুণা। কখনো ভাবতেন, অ্যান-মেরির দুঃখ দূর করবার জন্য বড় হয়ে তাঁকে বিয়ে করবেন।

মা যেমন পরিবারের সবাইকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন, সার্তরও তেমনি দাদামশাই ও দিদিমাকে খুশি করবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। মা এ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। আর এ-কাজটি সহজও ছিল। চার্লস সোয়াইটজর ছিলেন নিঃসঙ্গ; ছেলেরা বড় হয়ে গেছে, বাবাকে ভয় করে চলে, কাছে ঘেঁসে না; স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মেজাজের মিল নেই। সুতরাং অবসর সময়ে সার্তর হলেন দাদুর একমাত্র সঙ্গী। দাদুর সঙ্গে খেলা করা, তাঁর কাছে গল্প শোনা, নানা কলা-কৌশল দিয়ে তাঁকে চমক লাগানো—এই সব ছিল সার্তর-এর প্রধান কাজ। সর্বদা বড়দের সঙ্গে থাকতেন বলে বড়োটে কথা বলা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল তাঁর। বয়স্করা তা শুনে আমোদ পেতেন খুব। সার্তর বেশী খেতে পারলে প্রশংসা পেতেন, তাঁর কথা শুনে লোকে আনন্দ পেত; অন্যকে আমোদ দেওয়াই যেন তাঁর

একমাত্র কাজ। অন্য কর্তব্য ছিল না। কারণ মা, দাদু ও দিদিমার ভালোবাসা তাঁকে নিরন্তর ঘিরে থাকত। কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হবার সুযোগ পাননি।

দশ বছর পর্যন্ত এক বৃদ্ধ এবং দুই নারী নিয়ে ছিল সার্তর-এর বাইরের জগৎ। বর্ণপরিচয়ের পর ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে লাগলেন অন্তরলোকের নিজস্ব জগৎ,—বইয়ের জগৎ। দাদুর লাইব্রেরীর দ্বার তাঁর কাছে ছিল অবারিত। ছোটদের কিংবা বড়দের বইয়ের ভেদাভেদ ছিল না। যে বই খুশি পড়তেন। অনেক কিছুই বোঝা যেত না। কিছু বোঝা, কিছু না বোঝার রহস্য তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করত। বই ছেড়ে উঠতে পারতেন না। দিনের শেষে ঘর অন্ধকার হয়ে উঠত। মা এসে আলো জেবলে দিয়ে বলতেন, 'চোখ যে যাবে!' একবার "মাদাম বোভারি" পড়তে চাওয়ায় মা বলেছিলেন, 'এখনই যদি এসব বই পড় তাহলে বড় হয়ে কি পড়বে?' সার্তর জবাব দিয়েছিলেন, 'বড় হয়ে বই পড়ব না, কাহিনীর জীবন নিজেই যাপন করব।'

দাদু নাতির পড়ায় এত আগ্রহ দেখে গর্ববোধ করতেন। কিন্তু খুব আশা করে স্কুলে ভর্তি করবার জন্য নিয়ে গেলেন, শ্রুতিলিখনে ভুল বানানের বহর দেখে তাঁর মেজাজ বিগড়ে গেল। এই প্রথম চার্লস নাতির উপর রাগ করলেন। নিশ্চয়ই এটা তার মতলববী, ইচ্ছা করেই ভুল করেছে। হেডমাস্টারের সঙ্গে ঝগড়া করে সার্তরকে বাড়ি নিয়ে এলেন।

সাত-আট বছরের বালকের মনে ধারণা হয়েছিল তাঁর জীবন মা ও দাদুর হাতের মুঠোয়, নিজস্ব বলে কিছু অবশিষ্ট নেই। এই পৃথিবীতে তিনি যেন বিনা টিকিটের যাত্রী। তাই সসঙ্কোচে বাস্তব জগত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে চাইতেন। নিজেকে নিয়ে যেতেন বইয়ের জগতে, কল্পনার জগতে। সেই অন্তরঙ্গ জগতকে রূপ দেবার আকাঙ্ক্ষা জাগল। সার্তর লিখতে শুরু করলেন। একে একে খাতা ভর্তি হতে লাগল। বালকের পক্ষে মৌলিক সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর প্রথম রচনা ছিল শুধুই সুপরিচিত কাহিনীর প্রায় আক্ষরিক নকল। নিজের হাতে খাতায় নকল করে তৃপ্তি পেতেন। সৃষ্টির মিথ্যা মোহে বালকের মন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত। কিছুকাল পরে নিজের উদ্ভাবনের সঙ্গে অন্য লেখকের রচনা মিশিয়ে একের পর এক উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করলেন। সার্তর বলছেন, I adored plagiarism...লেখা চুরি করা যে অপরাধ তা মনেই হত না। কথা নিয়ে খেলা ছিল তাঁর কাছে নেশার মতো। কেননা, I saw words as the quintessence of things. Nothing disturbed me more than to see my scrawl little by little exchange its will-o'-the-wisp sheen for the dull consistency of matter; it was the imaginary made real. Trapped in their names, a lion, a Second Empire Captain, a Bedouin were introduced into the dining room; they remained there for ever imprisoned, given body by signs; it was as if I had anchored my dreams to the world by the scratching of a steel nib.

সার্তর নিজেই ছিলেন তাঁর সকল উপন্যাসের নায়ক। তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা ছিল নগণ্য; বালকদের খেলাধূলা এবং চিন্তাবিনোদনের অন্যান্য যে-সব শখ থাকে সার্তর-এর তা ছিল না। নায়কের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করাই ছিল তাঁর একমাত্র খেলা। এই খেলার মোহ থেকে সার্তর মুক্তি পেলেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। তিনি নায়ক হিসাবে যে কাইজারকে সৃষ্টি করলেন তাঁর পরাজয়ের এবং যুদ্ধ-সমাপ্তির তারিখ নির্দিষ্ট ছিল।

কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হবার পরও যখন যুদ্ধ শেষ হল না, কাইজারের প্রতাপ অব্যাহত রইলো, তখন কিশোর লেখকের কলমের শক্তির উপর আস্থা ক্ষুণ্ণ হল। এতদিন কী এক মিথ্যার জগৎ নিয়ে সময় কেটেছে! লেখার খাতাগুলি সমুদ্র-তীরে বালির মধ্যে কবর দিয়ে এলেন। সাময়িকভাবে লেখা বন্ধ হয়ে গেল।

লেখা একেবারে বন্ধ হয়নি। হতে পারে না। কারণ লেখক হবার জন্যই তাঁর জন্ম হয়েছে। সার্তর বলেছেন, পিতার মৃত্যু তাঁকে অন্যের প্রভাব থেকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্তি তিনি পাননি। দাদামশাই তাঁকে নানা দিক থেকে প্রভাবান্বিত করেছেন। বিশেষ করে শব্দের প্রতি মোহ সৃষ্টিতে। দাদু ছিলেন ভাষা-শিক্ষক। প্রত্যেকটি শব্দের পৃথক রূপ উপলব্ধি করবার সাধনা ছিল তাঁর। শব্দের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধির ব্যগ্রতা সার্তর-এর মধ্যেও পরিস্ফুট। শব্দকে এত ভালো করে চিনেছেন বলেই তাঁর ধারণা, you talk in your own language, but you write in a foreign one. সব লেখকই নিজের অনুভূতির অনুবাদক। কথার সঙ্গে লেখার এই প্রভেদ। এর ফলে লেখায় খানিকটা কৃত্রিমতা এসে যায়। একটু বাড়িয়ে শাত্তোব্রিয়াঁ তাই বলেছেন, আমি গ্রন্থ উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র।

সার্তর তাঁর জীবনে সুবিন্যস্ত শব্দমালা বা সাহিত্যের প্রভাব স্বীকার করেছেন আত্মচরিতের নামকরণ। "ওয়ার্ডস" দুই অধ্যায়ে বিভক্ত—পাঠ ও লেখা। শৈশব থেকে লেখা ও পড়া তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে। কিন্তু এখন আর মোহ নেই। শুধু অভ্যাসের বশেই লিখে চলেছেন : It is my habit and it is also my profession. For a long while I treated my pen as a sword : now I realise how helpless we are. It does not matter : I am writing, I shall write books; they are needed; they have a use all the same. Culture saves nothing and nobody, nor does it justify.

সাহিত্যের মূল্য সম্বন্ধে এই নৈরাশ্য একটু আকস্মিক মনে হবে। প্রতিরোধের নেতা হিসাবে সার্তর বিশ্বাস করতেন সাহিত্যের তরবারি দিয়ে রাজনৈতিক বৈষম্য দূর করা যায়। আজ সেই তরবারিকে ভোঁতা কেন মনে হল কে জানে! সার্তর হয়ত এই ভেবেই বলেছেন যে, রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে এমন সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয় যা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সার্তর মনে করেন, ভালো লেখা ও খ্যাতি একই সঙ্গে আসে। কিন্তু খ্যাতি পেলেই শিল্পীর মৃত্যু ঘটে। সার্তর নিজেকে প্রতিভাবান লেখক হিসাবে দাবী করেন না। নিজেকে বিশ্লেষণ করে এই আত্মপরিচয় তিনি পেয়েছেন : I have never seen myself as the happy owner of a 'talent' : my one concern was to save myself—nothing in my hands, nothing in my pockets—through work and faith. Now at last my unadulterated choice did not set me up above anyone : . . . A whole man, made of all men, worth all of them, and any one of them worth him.

"ওয়ার্ডস" নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল একটি আত্মচরিত। সার্তর পরিণত বুদ্ধি দিয়ে আপন শৈশবকে বিশ্লেষণ ও বিচার করেছেন। শৈশব-স্মৃতির প্রতি যে স্বাভাবিক দুর্বলতা থাকে সার্তর তা থেকে মুক্ত। তিনি নির্মমভাবে বুর্জোয়া পরিবারে

তাঁর শৈশব-জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি, কৃত্রিমতা ইত্যাদি উদ্ঘাটন করেছেন। তুচ্ছ বিষয়কে ফেনিয়ে বইয়ের আকার বড় করা হয়নি। আজকের জীবনে শৈশবের অনেক কিছুই বেঁচে আছে; সেই জন্য স্মৃতিকথার মূল্য। নিজেকে প্রচার করবার জন্য নয়।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

An Area of Darkness. *By* V. S. Naipaul. Andre Deutsch. London 25*s*.

A House for Mr. Biswas-এর লেখক ভি. এস. নায়পল প্রায় দু বছর আগে এ দেশে আসেন। তাঁর পিতামহের জন্মভূমিতে প্রায় এক বৎসর বাসের অভিজ্ঞতার ফল *An Area of Darkness*. বইটি নিয়ে এদেশে ও বিদেশে যথেষ্ট আলোড়ন হয়েছে। এর কারণ বর্তমান ভারতের সামগ্রিক রূপ নিয়ে এই ধরনের সুলিখিত বই অনেকদিন বেরোয়নি। তা ছাড়া বইয়ের নাম থেকেই বোঝা শক্ত নয় যে লেখকের বক্তব্য নিয়ে পাঠকদের একমত হওয়া শক্ত।

বর্টাটকে লেখক 'An Experience of India' বলেছেন। 'Experience' কথাটার একটা তাৎপর্য আছে যা বাংলা 'অভিজ্ঞতা' দিয়ে ঠিক প্রকাশ করা যায় না। এ দেশে আসার আগে থেকেই নায়পল যেন বুঝেছিলেন যে ভারতের যে অস্পষ্ট, তমসাবৃত চেহারা ঠিনিদাদে তাঁর বাল্যকালকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, চাক্ষুষ পরিচয়ে সেই দেশের চেহারাটা তাঁর কাছে খুব সুন্দর মনে হবে না। এই ধারণাটা ভেবে দেখলে খুব অমূলক নয়। লেখক নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন তাঁর কোনো দেশ নেই, জাত নেই, তিনি নিরীশ্বর ও পুরোপুরি ব্যক্তিস্ববাদী। এহেন লোকের সঙ্গে সনাতন ভারতের মোলাকৎ যে সংঘর্ষে পরিণত হবে তা আর আশ্চর্য কি।

জাহাজ ছেড়ে বোম্বাইয়ে পদার্পণ করেই নায়পল এক অভূতপূর্ব ক্লেশ বোধ করলেন। তাঁর মনে হল নগরীর জনস্রোতের মধ্যে তাঁর স্বত্তা লোপ পেয়ে গেছে, তিনি জনমণ্ডলীর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন। 'একাকার' কথাটা এখানে মূলগত অর্থে ব্যবহার করা হোল। কারণ ঠিনিদাদ বা বিলেতের জনগণের সঙ্গে লেখকের অন্তত শারীরিক স্বাতন্ত্র্য ছিল। বোম্বাইয়ে তাও খোয়া গেল।

তারপর ভারত-পরিক্রমা সুরু হল এবং নায়পল প্রতিপদেই ক্লান্ত ও পীড়িত বোধ করতে লাগলেন। প্রথমত তিনি গরম ও ধুলোয় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দ্বিতীয়ত সারা দেশটাকে তাঁর একটা বিরাট আস্তাকুড় বলে মনে হোল। আস্তাকুড় কথাটা বেশ মোলায়েম। নায়পল বলেছেন 'India is like one vast latrine' পাতার পর পাতা ধরে তিনি জনবহুল সহরের রাজপথে আর মাঠে ঘাটে, রেল লাইনের ধারে আর নদীর পারে, সমুদ্রের কূলে আর পাহাড়ের গায়ে ভারতীয়দের মলমূত্রত্যাগের বর্ণনা করেছেন। যা দেখে নায়পল সবচেয়ে ক্লিষ্ট হয়েছেন তা হলো দেশের মানুষের ও সমাজের চেহারা। শাসকগোষ্ঠির মূলধন হলো কথার বেসাতি কারণ কাজের দিক থেকে তাঁরা দেওয়ানা। আমরা মুখে বড় বড় কথা বলি, কথায় কথায় ভারতের আত্মা ও পারমার্থিক শক্তির দোহাই দিই অথচ কার্যত আমরা অর্থলোলুপ ও নিষ্ঠুর। শঠতা, ভণ্ডামী ও আদর্শহীনতা আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে রন্ধ্রগত হয়ে গেছে। নায়পল ভারতীয় চরিত্রের এই রূপ দেখে মর্মাহত

হয়েছেন। তিনি তাঁর বইয়ে রাজনীতি বা অর্থনীতির হেরফের নিয়ে আলোচনা করেন নি। পাঠশালা পরিকল্পনায় কত ইস্পাত তৈরি হোল বা কত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হোল, কত লক্ষ একর জমিতে চাষের জল এলো বা কত কোটি হন্দর সার জমিতে ছড়ানো হোল, নেহরুর পরে কে দিল্লীশ্বর হবেন বা ভারতীয় গণতন্ত্র কোন পথে এ সব নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেন নি। তিনি মুখ্যতঃ মানুষ হিসেবে ভারতীয়রা কেমন এবং যে সব ঐতিহাসিক কারণ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের চিরকাল প্রভাবান্বিত করেছে ও এখনও করছে সেই জিনিষগুলিকে নিজের বুদ্ধিমত বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

বলাবাহুল্য শিক্ষিত ভারতীয়দের চেহারাটা নায়পলের চোখে বিসদৃশ লেগেছে। এর কারণ আমরা আমাদের জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রভাবগুলিকে খাপ খাইয়ে নিতে পারি নি। আমরা আচারে-ব্যবহারে, কথাবার্তায়, সাজসজ্জায় সাহেব হওয়ার চেষ্টা করি—নায়পল যাকে 'mimicry' বলেছেন আর হুতোম যাকে বলেছিলেন সাহেবের উঁচু কেতার গোবরের বস্ট (Bust)। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা, কল-কারখানা, অর্থনীতিক ও রাজনীতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও আমাদের ভেতরের চেহারাটা সনাতনী রয়ে গেছে। তার একটা প্রমাণ যে আমাদের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও অনেকে ঠিকুজি কুষ্ঠিতে বিশ্বাস করেন। ফলে আমাদের ব্যক্তিসত্তা দ্বিধাবিভক্ত—নায়পলের ভাষায় schizophrenic। অনেকটা হাঁসজারুর মত—না সাহেব না ভারতীয়, না পুরাতন না আধুনিক।

নায়পলের মতে আমাদের জাতীয় চরিত্রের অবনতির একটি মূল কারণ আমাদের জাতি-ভেদ প্রথা। এই প্রসঙ্গে নায়পল বলেছেন : Cast imprisons a man in his function. It leads to callouness, inefficiency and a hopelessly divided country, division to weakness, weakness to foreign rule. জাতিভেদ প্রথা আবহমান কাল ধরে আমাদের ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করেছে। জাতিভেদের ফলে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে আমরা বিদেশী আক্রমণকারীদের দ্বারা পরাভূত হয়েছি। এই প্রথাই আমাদের দেশকে world's largest slum করে তুলেছে। আমাদের মন থেকে মানুষের সেবার কথা মুছে দিয়েছে, শ্রমবিমুখতাকে আমাদের মজ্জাগত করেছে। লোকের জন্যে দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়ার কথা আমরা ভাবতে পারি না। জলে লোককে ডুবতে দেখলে আমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখি। দেশে যখন জীবন মরণ সমস্যা দেখা দেয় আমরা তখন ওজস্বিনী ভাষায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা করি আর সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়।

এই জাতিভেদ প্রথার পটভূমিতে নায়পল মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও কর্মের আলোচনা করে তার আসল তাৎপর্য বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আমরা অনেকেই সামাজিক ব্যাপারে গান্ধীজিকে পুরাতনপন্থী বলে মনে করি। কিন্তু জাতিভেদের কুফল মনে রাখলে আমরা বুঝতে পারবো মহাত্মা গান্ধী কেন বার বার আমাদের নোংরামীর কথা উল্লেখ করেছেন, কেন বলেছেন স্বহস্তে শৌচাগার পরিষ্কার করা সুচীতার পরিচায়ক, কেন বলেছেন মানুষের সেবা সবচেয়ে বড় ধর্ম, কেন বলেছেন খেটে খাওয়ার মতন সম্মানজনক কাজ নেই। এইভাবে বিচার করলে আমরা বুঝবো যে এগুলি বাতিকগ্রস্ত লোকের কথা নয়, এ জাতি-প্রথার মূলে কুঠারাঘাতের চেষ্টা। কিন্তু স্বাধীন ভারতে আমরা তাঁকে অবতার বলে পূজা করি, তাঁর শিক্ষা নিইনি। নায়পলের ভাষায় : India undid him. He became a Mahatma. His message became irrelevant.

খুব কম কথায় এই হলো *An Area of Darkness*-এর মোটামুটি বক্তব্য। নায়পলের কড়া সমালোচনা আমরা অনেকে বরদাস্ত করতে পারি নি। অনেকেই বইটি পড়ে বা না পড়ে এটিকে *Mother India* বা *Verdict on India*-র সমগোত্রীয় করতে চেষ্টা করেছেন। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে এটা ঠিক নয়। নায়পলের বলবার কায়দাটা অবশ্যই নতুন। অতিশয়োক্তি ও সংযম বাদ দিলে নায়পল কিন্তু আমাদের যে সব মোটা মোটা দোষগুলি দেখিয়েছেন ইতিপূর্বে এদেশের ও বিদেশের অনেকেই সেগুলির বহুবার উল্লেখ করেছেন। সেই সব মহাজনদের পদাঙ্কানুসরণ করে নায়পল বন্ধুর কাজ করেছেন। মাঝে মাঝে এইরকম ঘা না খেলে আত্মম্ভরিতা ও আত্মতৃপ্তি আমাদের পেয়ে বসবে। আমাদের আর শুধরোবার পথ থাকবে না।

নায়পল আমাদের 'গাল' দিয়েছেন বলে তাঁকে দোষ দেওয়া সুবিচার হবে না। বইটির আসল গলদ অন্যত্র। সেটা হলো নায়পলের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী। অনেকটা অন্ধের হাতির পা দেখে হাতির চেহারাটাকে থামের মতন ভাবার মত। বইটা যাঁরা মন দিয়ে পড়বেন তাঁরা দেখবেন যে লেখক আমাদের জীবনের কয়েকটা দিক বেছে নিয়ে সেইগুলিই সব ও সেই-গুলিই সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। খুব স্থূলভাবে বলতে গেলে বলা যায় এ যেন খানিকটা মার্কিন দেশকে মগের মুলুক বলে বাতিল করে দেবার মতন। তা ছাড়া একটা দেশকে বুঝতে হলে একবছর যথেষ্ট কিনা সেটা তর্কসাপেক্ষ। আর আজকের দিনে যখন আমরা সামাজিক ও অর্থনীতিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় পাপ দারিদ্র ও অজ্ঞানতা দূর করার চেষ্টা করছি তখন সেইগুলি বাদ দিয়ে সমাজ ও মানুষের চেহারার বোধহয় সঠিক বিচারও সম্ভব নয়। এই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই নায়পল তাঁর বর্ষ-ব্যাপি ভারত-পরিক্রমায় এমন কিছু দেখলেন না যা তাঁর মনে আশার সঞ্চার করতে পেরেছে, এমন একজন লোক পেলেন না যে মনুষ্যপদবাচ্য। অন্তত তাঁর বইয়ে চিত্রিত নরনারীর বর্ণনা পড়ে তাই মনে হয়।

নায়পল বহুবার বলেছেন যে আমাদের বড় দোষ যে আমরা কোন জিনিষকে ইতিহাসের ধারা হিসেবে দেখতে পারি না। এই প্রসঙ্গে কেউ যদি লেখককে 'আপনার মুখ আপনি দেখ' বলেন তা হলে খুব অন্যায় হবে না। নায়পলের ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমাদের ইতিহাস অসুন্দর, আমাদের বর্তমান অসুন্দর, আমাদের ভবিষ্যত তমসাবৃত। তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টির একটি নমুনা হল যে তিনি খুব ঠাট্টার ভাব না নিয়ে বলেছেন যে পঞ্চায়তী রাজ্যের আওতায় হয়ত অদূরভবিষ্যতে ন্যায় বিচারের নামে গ্রামে গ্রামে লোকেদের নাক-কাটা সুরু হয়ে যাবে কারণ আমাদের গৌরবময় অতীতে এই জাতীয় শারীরিক দণ্ডের নজীর আছে। নায়পল অনেক মন্তব্য এই ধরনের ঐতিহাসিক পারম্পর্য ও যুক্তির ওপর খাড়া করেছেন। এই ধরনের যুক্তির দোহাই দিয়ে বলা যেতে পারে যে লেখকের বর্তমান বাসভূমি বিলেতে ভবিষ্যতে হয়ত লোককে রুটি চুরির অপরাধে ফাঁসীকাঠে চড়ানো হবে কারন সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও, লোককে সামান্য চুরীর অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

নায়পলের লেখা ঝকঝকে, তাঁর বর্ণনাশক্তি অসাধারণ, তাঁর দেখবার চোখ তীক্ষ্ণ। একদল লোক সেইজন্যে নায়পলের বইটির নির্জলা প্রশংসা করেছেন। তাঁদের কথা হোল যে সাহিত্যিকের প্রথম কর্তব্য লেখা সুখপাঠ্য ও সরস করা, বক্তব্য তাঁর কাছে সবসময়ে বড় কথা নয়। কিন্তু এই যুক্তি *An Area of Darkness*-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে খুব

পাকা কাজ হবে না। কারণ এই বই শুধু সাহিত্য বা ভ্রমণ কাহিনী নয়, এতে একটা দেশের ও জাতির চরিত্রও বিচার করা হয়েছে। নায়পল যা বলেছেন তা ভেবে চিন্তে বলেছেন, এবং তাঁর আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা অন্যায়। তা ছাড়া সব ভাল লেখকদের মত নায়পলের লেখার মধ্যে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বও প্রকাশ পেয়েছে। প্রশ্ন হলো যে সেই ব্যক্তিত্বটা কি রকম। সত্যের খাতিরে বলতে হয় তা খুব চিত্তগ্রাহী নয়। আমরা আগেই দেখেছি নায়পল তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলেছেন তাঁর দেবদ্বিজে ভক্তি নেই। বই পড়ার পর মনে হয় যে এ ছাড়া তাঁর নিপীড়িত মানুষের প্রতি টান বা ভালবাসাও নেই। সেইজন্যেই বইটির লিপিচাতুর্য ও সাহিত্যিক প্রসাদগুণসত্ত্বেও মনে হয় এর কোথায় যেন একটা বড় ফাঁক রয়ে গেছে।

রামপ্রসাদ সেন

আজকাল জিনিষপত্র
একটু দেখেশুনে
কেনা দরকার

★

যদি আপনি
টেঁকসই ভাল জিনিস চান
প্রেমচাঁদ-এর তৈরী
চট আর থলি
সব সময় নির্ভাবনায়
কিনতে পারেন

প্রস্তুতকারক :
কানোরিয়া কোম্পানি লিমিটেড
৯ র‍্যাবোর্ণ রোড
কলিকাতা ১
ফোন : ২২-৯১২১/২৬ (৬টি লাইন)